উৎসর্গ।

রাণাঘাটের জমীন্দার,
পরম ক্ষেমাস্পদ,

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী

স্নেহাস্পদেষু—

সাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন মিদং—

মৎপ্রণীত সামাজিক আখ্যায়িকা "ছিন্ন-মস্তা"র পাণ্ডুলিপি, তোমার জ্যেষ্ঠ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের কর কমলে উপহার প্রদত্ত হয়। তিনি [illegible] আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা "ছিন্নমস্তা"র সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এবারও মুদ্রিত হইবে।

অনেক দিনের পর সেই "ছিন্ন-মস্তা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাও তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিবার সাধ ছিল, কিন্তু বিধাতা সে সাধে বাধ পাড়িয়াছেন। এজন্য দ্বিতীয় সংস্করণ তোমার নামে উৎসর্গ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিলাম।

বঙ্গের ভূ-রাজস্ব ও জমীন্দারগণের সহিত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে বঙ্গের জমীন্দারগণই, বঙ্গবাসীর প্রকৃত ভূস্বামী। হিন্দুগণ পিতৃ মাতৃ কুলের শ্রাদ্ধ করিবার সময়, শ্রাদ্ধীয় পবিত্রোপহার দ্বারা সর্ব্বাগ্রে যে ভূস্বামীর তর্পণ করিয়া থাকেন, তোমার সর্ব্বগুণ নিকেতন জ্যেষ্ঠ, আমাদের সেইরূপ ভূস্বামী ছিলেন। অতএব আমার অতি আদরের ধন "ছিন্ন-মস্তা" তাঁহার তর্পণ উদ্দেশে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। ইতি—

চৈতন্য-চতুষ্পাঠী।
১৩নং ডাক্তার্স লেন। তালতলা,—
কলিকাতা। চৈঃ অঃ ৪১০। ফাল্গুন।

ত্বদীয় শুভার্থী,—
শ্রীকালীময় ঘটক।

গ্রন্থকারের ভূমিকা।

"যে বিশ্বে তপন জ্বলে.
যে বিশ্বে চন্দ্রমা খেলে,
সে বিশ্বে কি ঝিকিমিকি
জোনাকীরা জ্বলে না ?
রবির অগিনি ছাড়ি,
সোমের দীপিতি ছাড়ি,
জোনাকী হেরিতে প্রাণ
কভু কিহে চাহেনা ?"

কবিকাহিনী.—বন কুসুম।

ভক্তিভাজন গ্রন্থকার।

মহাশয়,—

আপনার স্নেহ প্রদত্ত উপহার আমার শিরোধার্য্য। আমার মতে আপনার "ছিন্ন-মস্তা" একটী সম্পূর্ণ নূতন আখ্যায়িকা। ইহাতে, বঙ্গ দেশীয় সামান্য গৃহস্থগণ হীনাবস্থায় বিবাহ করিয়া কিরূপে অধঃপাতে যায়, সাধ্বী পত্নীর চরিত্র প্রভাবে কিরূপে অসৎ ও উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হয়, গৃহস্থা স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধানার চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহা কিরূপে অন্যান্য স্ত্রী-গণে সংক্রামিত হয়, পত্নী অপ্রিয় বাদিনী ও প্রতিকূলাচারিণী হইলে সংসার কিরূপ অসুখের স্থান হয়, প্রতিকূলা শক্তি হইতে কিরূপে মানুষের সহ্য,—সহ্য হইতে তপস্যা,—তপস্যা হইতে অনুকূলা শক্তি লাভ হয়, তান্ত্রিকী শিক্ষায় বিশ্বাসী হইলে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে কিরূপ দৃঢ়তার সঞ্চার হয়,—ইত্যাদি বিষয় গুলি অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আমি ছিন্নমস্তা পাঠে প্রীত হইয়াছি এবং আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমার বন্ধুগণও এই প্রীতির অংশ প্রাপ্ত হয়েন। এই নিমিত্ত আপনাকে "ছিন্নমস্তা" প্রচারে অনুরোধ করি। ইহার মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। এই আপনার প্রথম আখ্যায়িকা, এজন্য নাম প্রচারে আপত্তি আছে বলিয়া আমাকেও তাহা অপ্রকাশ রাখিতে হইল। ইতি

বশম্বদ

রাণাঘাট, ১২৮৮। } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।

ছিন্নমস্তা।

প্রথম অধ্যায়।

"ষোড়শী"

১২৬২ সাল। বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নকাল; প্রচণ্ড রৌদ্র। বায়ুপ্রবাহ অগ্নিশিখাবৎ। বৃষ্টিপাতের কোন লক্ষণ নাই। পৃথ্বীদেবী যেন মনোদুঃখে চিতারোহণ করিয়াছেন। মরীচিকা-রূপিণী জ্বলৎ-শিখা বিকম্পিত হইতেছে; পক্ষিগণ, বৃক্ষশাখায় নিবিড় পল্লবের অন্তরাল হইতে স্থিরনেত্রে যেন তাহাই দেখিতেছে। গভীর নিশা-সদৃশ চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধপ্রায়। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত দামোদরতীরবর্ত্তী হরিপাড়ানামক পল্লীগ্রামস্থ কোন গৃহস্থের দরজার সম্মুখে এক খানি পালকী আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে একজন আরদালী ও একজন খান্‌সামা।

আরদালী হিন্দুস্থানী, কিন্তু বহুদিন বঙ্গদেশে চাকুরী করিতেছে। সে কবাটে আঘাত করিয়া এইরূপে ডাকিতে ছিল, "ভচাজ্যি মোছাই দরোয়াজা খুলিয়ে দ্যান্।"

বাহকগণ ঘর্ম্মাক্ত। পালকী নামাইয়া অদূরবর্ত্তী বৃক্ষ মূলে বসিল এবং দুর্গন্ধি ও মলিন উত্তরীয় ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাড়ার গরুবাছুরের দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রত্যাশায় দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আগন্তুকের কঠোর চীৎকারে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। একে আতপের রুক্ষতা, তাহাতে বৃষ্টি-বিরহিত বিশুদ্ধ বৈশাখ রৌদ্র; ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যুচ্চৈঃস্বরে,—"কেহে, দুপুরবেলা, দুওরটা ভাংলে যে।" বলিয়া দ্বারোদ্দেশে গমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদতলে গৃহিণী নিদ্রিতা ছিলেন। কোলের ছেলেটী স্তনমুখে করিয়াই নিদ্রা যাইতে ছিল। তাঁহার চীৎকারে গৃহিণীর ঘুম ভাঙ্গিল। শিশু চমকিয়া উঠিল; রোদন আরম্ভ করিল। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে, গৃহিণীর মুখে, "পোড়ার মুখ, একটু আস্তে কথা কহিতে পারনা,—" ইত্যাদি সুসম্ভাষণ শুনিতে শুনিতেই যাইতে হইল।

অন্তঃপুরস্থ কোন গৃহের দাওয়ায়, মাজায় কাপড় জড়ান, মাথার মাঝখানে খোঁপাবাঁধা, কয়েকটী বালিকা [illegible] খেলিতে ছিল। অদূরে, কুকুর, কি শৃগাল দৌড়িয়া গেলে কুররীযূথ যেমন স্তব্ধভাবে, চকিতলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, আঘাত শুনিবামাত্র, বালিকাকুল, সেইরূপে দ্বারাভিমুখে চাহিয়া রহিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াই, পালকীমধ্যবর্ত্তী যুবাকে, "বাবাজি? এস! এস! বাড়ীর ভিতর এস" বলিয়া সাদরে আহ্বান করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই, যুবক দেখিতে পাইলেন; বালিকাকুলের মধ্য হইতে একটী যুবতী অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া শশব্যস্তে গৃহান্তরে পলায়ন করিলেন। পলায়মানার পদাভরণগুলি, নবাগত নবীন যুবার হৃদয়ে কিরূপ বাজিয়াছিল, যদি পাঠকের মধ্যে কেহ দীর্ঘকালের পর, শ্বশুর বাড়ী গিয়া আপনার তরুণী পত্নীকে তাদৃশাবস্থায় পলাইতে দেখিয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন। অন্যের ভাগ্যে সে সুখ নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, গৃহিণীর নিকট গিয়া, "তোমার সহুরে জামাই এয়েছে, শাদা তণ্ডুলের অন্বেষণ কর, ধান ভানান্নে"—গৃহিণী তাঁহার সসমাস সন্ধিবদ্ধ পদের "ধান ভানান্নে—" পর্য্যন্ত শুনিয়াই ঈষৎ বিরক্তিসহকারে কহিলেন, "একটু আস্তে বল।" বস্তুতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আস্তে কথা কহিতে পারিতেন না। সকল কথাই উচ্চৈঃস্বরে কহিতেন। তাঁহার সকল কথাই রাগের কথা বলিয়া বোধ হইত। এই জন্য, তাঁহার একটী অতি দুরন্ত শিশুপুত্র তাঁহাকে বলিত, "তুই শালাবেটা এত বকিস্ কেন?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রথম প্রথম জামাতার সঙ্গে কথা কহিতেন না। পরে, কিছুদিন, কোলের ছেলেটী মাঝখানে সাক্ষী রাখিয়া কথা চলিত। অদ্য দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঘোমটার এক প্রান্ত, দন্ত অগ্রে চাপিয়া, কহিলেন, "দেবেশ, আজ কি বাড়ী থেকে গা, বাড়ীর সব্বাই ভাল আছেন ত?" দেবেশ বাবু দশটী টাকা তাঁহার চরণপর্ণে অর্পণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,

"বাটীর সকলেই ভাল আছেন, কিন্তু আমি আজ বরাবর কলিকাতা হইতে আসিতেছি।"

দেবেশ বাবু অপরাহ্ণে অন্তঃপুরপ্রাঙ্গনে একটী ক্ষুদ্র মোড়ার উপর বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুইটি প্রতিবেশিনী আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "ভাল! ভাল! আমাদের যে মনে প'ড়েছে এও ভাল।" দেবেশ কহিলেন, "আপনারা সততই আমার মনে আছেন, কিন্তু এখানে এলেই যখন খুন্ খারাপি উপস্থিত! তখন আর কি রূপে আসি বলুন?"

প্রতিবেশিনী দ্বয়ের একতরা, অন্যাকে কহিলেন, "সত্যি! ভাই, আমাদের কপ্‌লি বড় জ্বালাতন করে, ওর মত দুষ্ট মেয়ে ত্রিজগতে নেই। সেবার দেবেশ এলো,—সে ওদিকে নদীতে গিয়া পড়িল; বলে ডুবিয়া মরিব, আজ আর বাড়ী যাব না। শেষে আমি, আর সাবিত্রী ঠাকুরঝী কত কষ্টে জল থেকে তুলিয়া আনিলাম, ভিজে কাপড় শুদ্ধ দেবেশের কোলে দিলাম। তখনও বয়স কিছু কম নয়, তের বছর, সে আজ তিন বছরের কথা।"

অন্যা কহিলেন, "ছেলেবেলা মানুষের কত দোষ থাকে। এখন সেয়ানা হয়েছে, সোয়ামী কি তা বুঝেছে। সে দিন আমার সাক্ষাতে কেমন ভালমনুষের মত, কেমন পাকা মেয়ের মত কত কথা কহিল। কিন্তু দেবেশ বাবুর কথা তুলিলেই চুপ করে। বোধ হয়, গরিবের মেয়ে ব'লে দেবেশ বাবু তারে আদর করেন না, বনের পাখী আর কচি বউ কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, ইনি তা জানেন না।" দেবেশ বাবু এই রূপে প্রতিবেশিনী দিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। কত কি ভাবিতে লাগিলেন। একটু ইতস্ততঃ ভ্রমণ

করিয়া গৃহে আসিতেছেন। কোটার ছাদের উপরি ভাগে দৃষ্টি সংযোগ হইবামাত্র একটি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল। চকিতবৎ চক্ষে পড়িল। দেবেশের হৃদয়ে যেন কে আঘাত করিল। শোণিতপ্রবাহ দ্বিগুণবেগে বাহিত হইল। এই সময়ে পরীক্ষা করিলে কোন ডাক্তার বাবু নিশ্চয়ই শুনিতে পাইতেন, দেবেশ বাবুর হৃদয়যন্ত্র, ঘটিকাযন্ত্রবৎ "টক্-টক্" করিয়া বাজিতেছে—আনন্দের সুরে প্রীতির সুরে বাজিতেছে। কি বাজিতেছে? "এখন সেয়ানা হয়েছে, সোয়ামী কি তা বুঝেছে।" প্রতিবেশিনীর এই কথা, প্রীতির সুরে দেবেশ বাবুর হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ বাজিতেছে।

দেবেশ বাবুর স্ত্রীর নাম কপালিনী। অপভ্রংস নামক মহা-ব্যাকরণের নিপাতসূত্রে "আকার" ও "নী" র লোপ হইয়া "কপ্‌লি" পদ অবশিষ্ট ছিল। প্রায় সকল নামের অদৃষ্টেই এই বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। পিত্রালয়ের সকলেই তাহাকে ঐ নামে অভিহিত করিত। কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কন্যাকে কপালিনী বলিয়া ডাকিতেন। প্রতিবেশিনীদ্বয়, দেবেশের নিকট বিদায় লইয়া ছাদের উপর গেলেন। কপালিনী তথায় পূর্ব্ববৎ বালিকা কুলের সহিত খেলিতেছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার গাত্র মার্জ্জন ও কেশ বিন্যাস করিয়া দিলেন। গহনার বাক্স আনিয়া চরণ হইতে কবরী পর্য্যন্ত উত্তমরূপে সাজাইলেন। একছড়া মালতী ফুলের মালা গলায় দিয়া দিলেন। সর্ব্বাঙ্গ সুরভি-চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "যদি দেবেশ এক মাসের মধ্যে বাড়ী যাইতে চাহে, তোকে এই ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিব।" কপালিনী আলিসায় দুই হস্ত বিন্যস্ত

করিয়া, অধোদৃষ্টিতে, ভাবিতেছিলেন, "এই ছাদের উপর হইতে পড়িলে, কি হয়?" দেবেশ ভাবিলেন, কপালিনী তাঁহাকে দেখিতেছেন। তাঁহার ভাগ্যে এরূপ ঘটনা আর কখন ঘটে নাই। কপালিনী জিব্ কাটিয়া পশ্চাদ্‌গমনে সরিয়া গেলেন।

দেবেশ সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসিলেন। অনেক দিনের পর ভগ্নীপতি আসিয়াছেন; সম্বন্ধীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি গাঁয়ের গায়িয়ে বাজিয়ে ছোক্‌রাদের ডাকিয়া আনিলেন। একটা গাবচটা তবলা, চ্যাপ্ চেপে ডুগি এবং ডুরী ছেঁড়া ঢোলক আসিয়া পড়িল। গায়কগণ, সেই সকল সুযন্ত্রের সুসঙ্গতে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে গান ধরিলেন। রজকগৃহের ন্যায় গোলযোগ উপস্থিত হইল। সম্বন্ধীটি বড় ভাল মানুষ। তাঁহার মনে ক্লেশ হইবার শঙ্কায় দেবেশ বাবু কিছু বলিলেন না। বিশেষতঃ তখন তিনি আপন হৃদয়ের সঙ্গীত এমন মনোযোগের সহিত শুনিতে ছিলেন যে, তৎকালে আর কিছুই ভাল লাগিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নয় বৎসর বিবাহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিন চারিবার মাত্র তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্ত্রীর মুখ হইতে দুই তিনটী বিরক্তিকর কথা ভিন্ন, একটিও ভাল কথা শুনিতে পান নাই। কপালিনী কখন আপন ইচ্ছায় স্বামীকে মুখ দেখান নাই। তথাপি দেবেশ বাবু অন্যের যত্নে দুইবার তাঁহার মুখ দেখিয়াছিলেন। আজ সম্পূর্ণ নবীন ভাব। দেবেশ বাবুকে কপালিনী ছাদের উপর হইতে দেখিতেছিলেন। সন্ধ্যাসমীরণে তাঁহার অলকাবলী কম্পিত হইতেছিল, নিখুঁত নবপল্লব সদৃশ অপ্রশস্ত ললাটফলকে, রত্নবিজড়িত হৈমসিঁথির

প্রান্তবর্ত্তী মৌক্তিক পংক্তি, অচেতনের চেতনা বিধান করিয়া, অল্পে অল্পে দুলিতেছিল, সেই সময়ে কপালিনী দেবেশ বাবুকে দেখিতেছিলেন। তিনি এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতে-ছেন, এমন সময়ে আহারের জন্য ডাক আসিল।

দেবেশ বাবু আহারান্তে শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, শয্যায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। বস্ত্রের উপর হস্ত বিন্যস্ত করিলেন। হস্ত সবলে অন্য দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। দেবেশ বাবু কপালিনীকে কথা কহাইবার কত চেষ্টা করিলেন। সকলই বৃথা হইল। কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্য কত ভাল ভাল সামগ্রী আনিয়াছেন উঠিয়া দেখিতে কহিলেন, সকলই বৃথা হইল। কেবল একটি কথা শুনিলেন, "যারে ভালবাস, তারে ওসব দিও।" এ কথা শুনিয়া প্রথমে দেবেশের অসুখ হয় নাই। বরং আনন্দের সহিত, একটু জোরের সহিত, সপ্রতিভের ন্যায় বলিলেন, কপালিনী ভিন্ন তাঁহার ভালবাসার পাত্র আর কেহ নাই। কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যে তিনি বুঝিলেন, এ কথা কপালিনীর মুখের নহে, অন্তরের। নিস্তব্ধে শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন। সুষুপ্তি নাই,-লোচন নিদ্রাভারাক্রান্ত,তন্দ্রা-ভিভূত। কিয়ৎ কাল পরে, সে তন্দ্রা অপনীত হইল। গৃহ অন্ধকারময়। হস্তবিস্তারে বুঝিলেন, শয্যায় আর কেহ নাই। শশব্যস্তে দীপ প্রজ্বালিত করিলেন। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তিনটা বাজে। বদ্ধ দ্বার,—উদ্‌ঘাটিত। গৃহমধ্যে কপালিনী নাই। দেবেশ, বাটীর অন্য অন্য গৃহ স্থিত সকলকে জাগাইলেন। সকল ঘর অনুসন্ধান করা হইল,—বাটীর চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করা হইল,-কপালিনী কোথাও নাই!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ছুঁড়কো বউ।

চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইতেছে। "এদিক না সেদিক্, সেখানে না এখানে, এই বনে, কি ঐ বনে-" ইত্যাকারে সন্ধান করা হইতেছে। সকলের মনে কপালিনীকে পুনঃ প্রাপ্তির আশা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। দেবেশের মনে হইল, কপালিনী নদীতে পড়িয়াছে, এখনও মরে নাই। তিনি এই ভাব প্রকাশ করিবামাত্র, কয়েকটী লোক মসাল হস্তে নদী-তীরাভিমুখে দৌড়িল। দুই এক জন করিয়া সকলেই তরঙ্গিণী তটে সমাগত হইল।

নদী, গৃহের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী। এ পর্য্যন্ত কেহই সেদিকে অনুসন্ধান করে নাই। নদীর কথা কাহার মনেও হয় নাই। জলের ধারে ধারে মসালের আলোকে অনেক দূর,—বিশেষতঃ স্রোতের দিকে আরও অনেক দূর দেখা হইল, কপালিনীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মৎস্য কচ্ছপাদি আলোক দর্শনে জলোচ্ছ্বাস করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া কাহার কাহার

মনে এরূপ ভ্রম হইতে লাগিল, হয়ত কপালিনী এখনও জীবিত আছে। বৈশাখ মাসে দামোদরের অবস্থা এরূপ নহে যে, তাহাতে কেহ পড়িলে সহসা মৃত্যু হইতে পারে। যাহা হউক দামোদরেও কপালিনীকে পাওয়া গেল না। সকলে নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল।

ভট্টাচার্য্যের বাটীর ঈশানকোণে একটী পুরাতন আম্রবাগান। উহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ সকল প্রায়ই শাখাপল্লবশূন্য হইয়াছিল। রাত্রিকালে দেখিলে বোধ হইত যেন, পিশাচগণ, আকাশের দিকে বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে। যে সকল শিশু সূতিকাগারে,কিংবা দুই তিন মাসে মৃত্যু মুখে পতিত হইত, গৃহস্থেরা, ঐ বাগানে তাহাদিগকে সমাহিত করিত। কপালিনীর একটী শিশু ভ্রাতাও ঐ স্থানে সমাহিত হইয়াছিল। এই জন্য বাগানের ঐ দিকে লোক জনের বড় গতাগতি ছিল না। কিন্তু কপালিনী মধ্যে মধ্যে সেই সমাধিস্থলে গিয়া ভ্রাতার জন্য ক্রন্দন করিতেন। বাগানের এক প্রান্তে বহু কালের একটী কালী মন্দির ছিল। তথায় এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর কপালিনীকে বড় ভাল বাসিতেন। কপালিনী এই জন্য সঙ্গিনীগণ সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার প্রাঙ্গণে খেলিতে যাইতেন। মধ্যে মধ্যে মা কালীর মন্দিরে গিয়া কত প্রার্থনা করিতেন। একবার তাঁহার জনৈকা সঙ্গিনী ঐ প্রার্থনা শুনিয়াছিল। "মা কালী, রায় হাট থেকে যেন কেহ না আসে।" রায় হাট নামক স্থানে কপালিনীর শ্বশুরবাড়ী। যাহাহউক, ঐ বাগানে তিনি সর্ব্বদা গিয়া থাকেন বলিয়া জন কয়েক লোক ঐ বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। যদি কপালিনী সেখানে গিয়া থাকেন।

কপালিনী সেখানেও যান নাই। মধ্যে মধ্যে ঐ বাগানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব উপস্থিত হইত। কপালিনী হয় নদীতে পড়িয়া কোন গতিকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, নয় ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, সকলে, ইহাই অনুমান করিলেন।

আমরা অনেক অনুসন্ধান ও অনেক যত্নে সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, পক্ষিজাতির মধ্যেও কবির বা কীর্ত্তনের দল আছে। তাহাদের মধ্যেও "ধরতা দেয়ার" "পিছ দেউড়ি" প্রভৃতি আছে। কপালিনীকে সন্ধান করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল। কোকিলদলের ধরতা দোয়ারেরা "টাকিস্বরে চিতান মারিল।" সেই স্বর, বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল। এক বন হইতে অন্য বনে,—অন্য বন হইতে দূর বনে প্রতিধ্বনিত হইল। পরে তাহারা খাদে নামিয়া একৈক ক্রমে "কুউউ—" সংবাদে সঙ্গীতশক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। কোকিলকুলের স্বর-লহরী, প্রভাতপবনে তরঙ্গায়িত হইয়া নিদ্রিত জনের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিল। "কেলেসোনা নাম রাখিল রাধাবিনোদিনী" ভগ্ন করতালে তাল রক্ষা করিয়া বৈষ্ণব ঠাকুর গৃহস্থের দ্বারে, ঠাকুরের অষ্টোত্তর শত নামগান আরম্ভ করিলেন। বালিকাগণ কচি কচি বেলের পাতা, নানাবিধ ফুল ও চন্দনে রেকাব সাজাইয়া কুমারীকালোচিত ব্রত সাধনো[illegible]শে নদীতটে গমন করিতেছিল; গোলমাল দেখিয়া ভট্টাচা[illegible] বাড়ী উপস্থিত হইল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ গ্রামময় প্রচারিত হইল। কোন পল্লীতে গোল উঠিল "কপালিনীকে কুম্ভীরে খাইয়াছে।" কোন পল্লীতে "সর্পাঘাতে," কোন পল্লীতে বিসূচিকায়" ইত্যাদি প্রকারে সংবাদ, পল্লীবিশেষে বিভিন্ন আকার

ধারণ করিল। ক্রমশঃ পাড়ার, ভিন্ন পাড়ার, অনেক লোক জুটিল। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বুঝাইতে লাগিলেন। রামের মাসী, কপালিনীর জননীর হস্ত ধারণ করিয়া বক্ষে করাঘাত বারণ করিতে লাগিলেন। যুবতীগণ বদনে বসন চাপিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন, অশ্রুধারা তাহার পরিচয় দিতেছে। বয়োজ্যেষ্ঠাগণের, রোদনাপেক্ষা বচনের ভাগ বেশি। "আহা! কপালিনী এমন ছিল, আহা! অমন ছিল।" ইত্যাদি প্রকার বাক্যবিন্যাস আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তা বচনশীল, গৃহিণী অধীরা, দেবেশ নীরব।

দেখিতে দেখিতে বেলা হইল। নিকটস্থ রেলের ষ্টেসনে গাড়ী আসিবার সময় হইল। দেবেশ বাবু এই সংবাদটী বাটীতে দিয়া কলিকাতা যাইবেন। আজ যাওয়াটা মূঢ়ের কার্য্য হইলেও যাইবেন। মন, ছাই হইয়া যাইতেছে। এখানে থাকিয়াই বা কি করিবেন? বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং একটি হাউস চালাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন। অনুপস্থিতিতে চারি দিকে বিশৃ-ঙ্খলার সম্ভাবনা। সুতরাং তাঁহার শ্বশুরের মাতুলপুত্র রামদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রভাতকালীন নক্ষত্রবৎ সমাগতগণ একে একে গা ঢাকা হইলেন। নিতান্ত আত্মীয়া একটি স্ত্রী, আপন গৃহ কার্য্যের অন্য ব্যবস্থা করিয়া, এবাড়ীর বাসিপাট্ সারিলেন। রন্ধনাদি হইল, কিন্তু খায় কে? "মরার উপর খাঁড়ার ঘা।" শোকের সহিত সংশয়ের বিষম জ্বালা। "হয়ত আমার কপালিনী কোথায় ক্লেশ পাইতেছে।" সাক্ষাতে কপালিনীর মৃত্যু হইলে, জননীর

এ চিন্তা থাকিত না। জননী গৃহমধ্যে ভূমি শয্যায় বিলুণ্ঠিতা। আর্ত্তনাদে গৃহ বিদীর্ণ প্রায়। শিশুটি একবার স্তন মুখে করিতেছে, পরক্ষণে জননীর মুখ চাহিয়া রোদন করিতেছে। কপালিনীকে সম্বোধন করিয়া জননী "মা-মা" শব্দে রোদন করিতেছিলেন। হটাৎ একবার তাঁহার বোধ হইল; মা শব্দ যেন গৃহান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্ষণকাল নীরব হইবামাত্র পুনরপি মা শব্দ,—কপালিনীর কণ্ঠস্বরে মা শব্দ,—তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। জননী চমকিয়া উঠিলেন। চকিতবৎ গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারাভিমুখিনী হইয়া বসিলেন। কপালিনী দ্বারে দণ্ডায়মানা!

"বুড়ো মাগীর রকম দেখ! কেঁদে যে মলে।" বলিয়া এক লম্ফে নিকটস্থা হইয়া জননীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। জননী জড়বৎ স্তম্ভিত, অবাক্। কপালিনী মুখে হাত দিয়া দেখিলেন, দাঁত লাগিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাঙাবউ।

দেবেশ বাবুর সম্বন্ধী এক জন প্রজার নিকট কয়েক খানি দেড় হাত বহরের কাঁঠালি তক্তা পাইয়াছিলেন। ভগ্নীপতির তোষাখানায় ভাল ভাল ছাফ বাক্স দেখিয়া তাঁহারও নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, সেইরূপ একটি বাক্স প্রস্তুত করাইবেন। নানা কারণে এপর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কিছু কাল পরে তক্তাগুলি পাওয়ায় অভীষ্ট সিদ্ধির কতক সুযোগ হইল। সূত্রধরের সন্ধান করিতে লাগিলেন। গ্রামে সে পাট নাই। কালক্রমে কয়েক জন ছুতার বর্দ্ধমান হইতে তত্রত্য কোন গৃহস্থের বাড়ী কোটার কাটরা প্রস্তুত করিতে আসায় তাহাদের দ্বারা বাক্সের কাট কয়-খানি আঁটাইয়া লন। অন্যান্য উপকরণাভাবে কপালিনীর শয়ন গৃহে সেটি, সেই অবস্থায় বহুকাল পড়িয়াছিল; ডালাখানিও তাহার উপরে ছিল। তদুপরি শ্যামা প্রতিমার কতকগুলি কেশ স্থাপিত ছিল। এতদ্ব্যতীত মলিন বস্ত্র, ছিন্ন বালিশ প্রভৃতি এত আবর্জ্জনা তাহার উপর ছিল যে, সহজে সে দিকে দৃষ্টিপাত

করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইত না। দেবেশ বাবু তন্দ্রাভিভূত হইলে, কপালিনী গৃহ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিয়া বাক্স মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি তন্মধ্যস্থা হইয়া বাহিরের কাণ্ড সকলই অবগত হইতে ছিলেন। দেবেশ বাবু চলিয়া গেলে, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বাহির হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

"চাপের উপর চাপ,
উশোষ নেইরে বাপ।

শেষের চাপটী অধিক বলে পিষিতে লাগিল। গৃহিণী মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছেন শুনিয়া দৌড়িয়া আইলেন। মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হারান ধন সমীপে বসিয়া, আনন্দ প্রকাশের সময় পাইলেন না। গৃহিনীর চৈতন্য হইল ;--

"হা! পোড়া কপালির মেয়ে, তোর মনে এতও ছিল? কোথায় লুকিয়ে ছিলি? মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে?" বলিয়া, কপালিনীর গায়ে কতকগুলা তেলা পোকার পাথা, মাকড়সার জাল, কেশের গুঁড়া, ছেঁড়া বালিশের তুলা, লাগিয়া ছিল, ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন। গলিতললিতবসনবেশা কপালিনী হাসিতে হাসিতে মায়ের হাত ছাড়াইয়া পলাইলেন। গৃহান্তরের একান্তে একাকিনী নিরাশনে উপবিষ্টা হইয়া মাটিতে দাগ পাড়িতেছেন, আর ভাবিতেছেন।

"যে দিলে মনে ব্যথা,
তার সঙ্গে কিসের কথা? বাক্স খুলে,
জিনিসের লোভ দেখিয়ে, বলে কথা কও, মচ্ছি!"

পূর্ব্ব দিনের সেই বেশ রহিয়াছে, কেবল বাসি ফুলের ন্যায় মলিন, ঝটিকাহত কিসলয় সদৃশ ছিন্ন ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত বেশ-

কারিণী জনৈকা প্রতিবেশিনী বিষণ্ণ ভাবে সম্মুখে উপনীত হইয়া, "কপাল, তোমার এমন পোড়াকপাল? ছি! ছি! এত ঢলাঢলিও তুমি করিতে পার?" কপালিনী তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,

"কই! আমায় ছাদের উপর থেকে ফেলিয়া দিলিনে? প্রতিবেশিনী সক্রোধে কহিলেন,—

"হ্যাঁলা কপ্‌লি, তোর কি প্রাণে একটু ভয় হয় না? বড় মানুষের ছেলে, যদি আর একটা বিয়ে করে।"

"বেশত! বড় রাণী হইব।"

"সতিনের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী থাকিয়া কত সুখ, জাননা বলিয়াই হাসিতে হাসিতে বড় রাণী হইতেছ।"

"আমি কি আর শ্বশুর বাড়ী যাব?"

"কেন যাবেনা?"

"তাদের রাবণের পুরী, ম্যালা লোক, গোল মালে কাণ পাতা যায় না। আমার সেখানে মন টেকে না।"

কপালিনী অনেক কথা কহেন না, আজ অনেক কথা কহিতেছেন। সতিনের কথা শুনিয়া? না পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতির মনে ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া, কথা কহিয়া তাহার সাফাই করিতেছেন? প্রতিবেশিনী পুনরপি কহিলেন,

"সেকি! লো? দশটার সঙ্গে খাবপরবো, আমোদ আহ্লাদে দিন কেটে যাবে, আমরাত এই বুঝি।"

দশটার মুখে আগুন।"

"বড় হয়ে তোর এমন দশা হবে জানিতে পরিলে, ভট্‌চায্যি মহাশয় কোন নিমুঁড়ে নিছুঁড়ের বাড়ী তোর বিয়ে দিত।"

' বিয়ে মোটে না দিলে কি চলে না ?"

অন্যের চলুক আর না চলুক, তোমার মত বুনো জন্তুর বিয়ে না দেওয়াই উচিত ছিল।"

"না দেওয়াই উচিত ছিল।" এই কথাটি কপালিনীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,

আমার বিয়ে না দেওয়াই উচিত ছিল, ঠিক্ বলেছে। মা বলে, শ্বশুর বাড়ী গিয়া গুরুজনের কথা শুন, যে যা বলে, সহে থেকো। আমি কি তা পারিব ? তাদের কথাশুনে আমার গা জলে যায়। "কপালিনীকে অন্যমনস্কা দেখিয়া প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পাঠক মহাশয়কে এইবার একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংক্ষেপে কপালিনীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিতে হইবে। কপালিনীর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহ হয়। বর পক্ষীয়েরা বিবাহ কালে কন্যাকে সাত বৎসরে বলিয়া জানিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুইবৎসর বাড়াইয়া দেন। পাছে নিতান্ত বালিকা বলিয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। বর ঘর তাঁহার বড়ই মনোনীত হইয়াছিল। দেবেশ বাবুর পিতা কপালিনীর অসামান্য বাল্য সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাকে সহস্র-দল কমলের অস্ফুটকলিকা মনে করিয়াছিলেন। তিনি আরও ভাবিয়া ছিলেন, এই কমল বিকসিত হইলে, তাঁহার গৃহে সত্য সত্যই কমলার আবির্ভাব হইবে, কেবল সেই জন্যই তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের সহিত সাত বৎসরের বালিকার বিবাহ দেন। বিবাহ হইলেই এদেশীয় বালিকারা স্ত্রী মধ্যে পরিগণিতা হয়। ইহাদের ইচ্ছাবিরহেও গৃহিনীগণ তাহাদিগকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান

করেন। এইরূপে বালিকা বধূগণ, বয়ঃপ্রাপ্ত স্বামীর নিকট গমনে বাধিত হইলে, প্রায়ই তাহাদের স্বভাবে একটি দোষ ঘটে, কপালিনীর তাহা ঘটিয়াছিল। পাঠক, তাহার আভাস পাইয়াছেন। কপালিনীর অমানুষ স্বভাব, এই কৃত্রিম দোষে মিলিত হইয়া যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, লেখককে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

বিবাহের পর এপর্য্যন্ত কপালিনী কয়েকবার শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলেন। অধিককাল পিত্রালয়েই থাকিতেন। এই এগার বৎসরের সবিশেষ বৃত্তান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই; তবে এইরূপ শুনা যায়, কপালিনীকে ঘরে দিবার নিমিত্ত জাতা ও ননন্দা গণের প্রথম প্রথম বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইত। ক্রমে সে কষ্টের লাঘব হয়। কিন্তু কপালিনী ঘরে গিয়া এত দৌরাত্ম্য করিতেন যে, মধ্যে মধ্যে দেবেশ বাবুকে বিরক্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিতে হইত। কপালিনী বহির্গত হইয়া বাটির কোন নিভৃত স্থানে একাকিনী বসিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তজ্জন্য দেবেশ বাবু, প্রায়ই নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পাইতেন না। কপালিনীর দৌরাত্ম্য আর কিছু নহে, কেবল ঘরের এক কোণে বসিয়া, মুখ ঢাকিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেন। কি দিবা কি রাত্রি, মুখে কোন কথা শুনা যাইত না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, কিয়ৎ পরিমাণে, এ ভাবের অন্যথা হয়। দেবেশ বাবুর সঙ্গে দুই একটি কথা কহিতে আরম্ভ করেন। সে কথা আকাশবাণী-বৎ, বস্ত্ররূপ মেঘাভ্যন্তর হইতে আগত; আকাশবাণী এইরূপ। কখন বলিতেন,

"তোমাদের বাড়ীর মধ্যে আমার প্রাণ হাঁপাই হাঁপাই

করে। তুমি কেন আমার একটা আলাদা বাড়ী করে দেও না।”

দেবেশ বাবু উত্তর করিতেন,—

“তুমি ছেলে মানুষ, আলাদা বাড়ীতে বাস করিলে কত দোষ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পার না?”

কপালিনী তখন কোনরূপে কথা কহিতেন; উত্তর করিতেন না। একবার বলিয়াছিলেন,

“রাঙা বউকে কত টাকার গহনা দিয়াছ?”

কপালিনীর স্বামী দেবেশ রায়ের পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা, যোগেশ গঙ্গোপাধ্যায় পৃথক্ অন্নে ঐ বাড়ীতেই বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁহার স্ত্রী পরমরূপবতী নব যুবতী। রায় বাড়ীর বধূগণের মধ্যে, কপালিনী ব্যতীত, তাঁহার ন্যায় সুন্দরী আর কেহ আসেন নাই। এই জন্য সকলে তাঁহাকে রাঙাবউ বলত। রাঙাবউ অতিশয় বচনচতুরা ও প্রণয়শীলা। দেবেশ বাবু কপালিনীর প্রশ্নের উত্তরে রাঙা বউকে গহনা দেওয়া অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

উদ্যোগ পর্ব্ব।

রায় হাটের রাম শঙ্কর খুড়া বিজ্ঞ, পরোপকারী ও মতলব বাজ; গ্রামে যে কোন কায হউক, সকলের উপরই তাঁহার হাত। তাঁহাকে খুড়া বলিয়া সম্বোধন করায়, কেহ কিছু মনে করিতে পারেন। অতএব অগ্রে তাহারই সাফাই করা বিহিত।

ইঁহার নাম রাম শঙ্কর ঘোষাল। বড় বংশ জাত। ইংরাজ রাজ্যের প্রথমাবস্থায় ইঁহার পিতামহ বড় বড় চাকরী করিয়া অনেক সম্পত্তি ও উৎকৃষ্ট বাড়ী ঘর রাখিয়া গিয়াছেন। পিতার বিষয়কার্য্যে অপটুতা ও অমিতব্যয়িতা নিবন্ধন সেই বিপুল বিভব প্রায় নিঃশেষিত হয়। পুরাতন বাড়ীর অধিকাংশ, নিকটস্থা ভাগীরথীর উদরসাৎ হয়। যাহা ছিল, তাহারও অনেক টায়, বট-অশ্বত্থের উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছিল। দূর হইতে, এই পুরাতন অট্টালিকাটী, তরু ও তরুরুহ সমন্বিত পর্ব্বত বলিয়া, কখন কখন ভ্রম হইত। অবশিষ্ট তিন চারিটী ঘরে এবং তাহার পার্শ্বে আর

দুই একটি, পুরাতন ইটের নূতন ঘর প্রস্তুত করিয়া রামশঙ্কর ঘোষাল অনেকগুলি পরিবারের সহিত বাস করিতেন। ভূ-সম্পত্তির অবশেষ, যাহা কিছু ছিল, তাহার আয়ে সচ্ছন্দে সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। সুতরাং অন্যান্য নানা কার্য্যে তাঁহার কোন বাধা ছিল না।

বয়োজ্যেষ্ঠতা ও পিতৃসমকালীনতা প্রযুক্ত তিনি গ্রাম সম্পর্কে অনেকের খুড়া হইতেন। কাল সহকারে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের পুত্র পৌত্রাদিরও খুড়া হইয়া উঠেন। এই জন্য আমরাও তাঁহাকে খুড়া বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে তাঁহাকে কেবল মাত্র খুড়া, বলিয়াই সম্বোধন করিব। তাঁহার পিতৃ পিতামহ, অর্থসাধ্য অনেক সৎকার্য্য ও সৎকীর্ত্তি করিয়াছিলেন। খুড়া যদিও ততদূর পারিয়া উঠিতেন না, কিন্তু অন্যান্য বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেকটা পোষাইয়া দিতেন। এই জন্য রায় হাটের বারএয়ারি পূজা, দলাদলি, জাতিরক্ষা, 'বংশরক্ষা' প্রভৃতি কোন কার্য্যই, খুড়াকে ছাড়িয়া, হইতে পারিত না। ইত্যাকার সকল কার্য্যেই ষোল আনা যোগ দিতেন। কেবল রায় হাটের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কালে বলিয়া ছিলেন, "মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখিয়া কি চাকরী করিতে যাইবে?" এবং শিশুপাঠশালার শিক্ষা প্রণালীতে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাষা পুস্তক পড়িয়া কি হইবে, বালকগণকে মুগ্ধবোধ না পড়াইলে সংস্কার হয় না।"

পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ বংশ রক্ষার কথা শুনিয়া মনে

মনে হাসিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন, নিষেধ করি, আর হাসিবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খুড়া পরোপকারী। অসঙ্গতি কি অন্যবিধ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ বিবাহ না হওয়ায় কাহার বংশ লোপের সম্ভাবনা হইলে, খুড়া যেমন করিয়া হউক, তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেন। বনিয়াদি বড় ঘরোয়ানা বলিয়া তাঁহার ব্যবহারটিও একটু উচ্চ ধরণের ছিল। নিমন্ত্রণে গিয়া, অৰ্দ্ধপোয়া গাভীঘৃতের কমে তাঁহার প্রাত্যহিক আহার হয় না, খুড়া এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। সজল দুগ্ধ খাইতে পারিতেন না, এইজন্য প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে স্বয়ং গোয়ালা বউর বাড়ী হইতে দুগ্ধ আনিতেন। তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন—"সং ও সক্ষমকে সাহায্য দানে পুণ্য নাই। আমার পিতা ও পিতামহ যে, কত গণ্ডমূর্খের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমার পিতার কলিকাতার বাটীতে নিয়ত একশত মূর্খ ভাত খাইত।" আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খুড়াও, এতাদৃশ কোন সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে মহাব্যস্ত ছিলেন।

হরিপাড়ার ভট্টাচার্য্য বাটীতে যে দেবেশ বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এই রায় হাটে তাঁহার নিবাস। তাঁহাদের উপাধি রায়। জনশ্রুতি এই রূপ, পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে কোন রাজ বংশের বাস ছিল। গ্রামের নাম রাজপাট ছিল। দেবেশ বাবুর পিতামহ গ্রামের মধ্যস্থলে একটি হাট বসাইয়া "রায় হাট" বলিয়া উহার নামকরণ করেন। কালক্রমে ঐ হাটের নাম অনুসারে গ্রামটী "রায় হাট" নামে খ্যাত হইয়াছে। দেবেশ বাবু হরিপাড়ায় যাইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে একদা নিজ বাটীর

পুরোভাগস্থ পুষ্পোদ্যানে পাদচারণ পূর্ব্বক মালিদিগের কার্য্য দর্শন করিতেছিলেন। চম্পক তরুর ছায়ায়, এক খানি মার্কিন চেয়ারে খুড়া বসিয়া আছেন। দেবেশ বাবু যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"খুড়ো, অন্যত্র চেষ্টা দেখ; আমি এরূপ বিষয় বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে পারি না।" খুড়া কহিলেন,—"রায় হাটের অন্তর্ব্বর্ত্তী বাস্ত উদ্বাস্ত এক বন্ধে কুড়ি বিঘা লাখেরাজ জমি মায় বাগান বন্ধক রাখিয়া চারিশত টাকা দিবার ভাবনা কি?

"ভাবনা অন্যরূপ।"

"কি?"

"আপনি যে উপলক্ষে টাকা চাহিতেছেন, ইহাতে কোন কিছু খুলিয়া বলিবার যো নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন, টাকা আমি দিব না।" খুড়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"তবে আর ব্রাহ্মণ ঘরটা বজায় হয় না। এত দিনে রঘুমণি ঘোষালের বংশ লোপ হইল।" দেবেশ বাবু এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না।

রায় হাটে এক ঘর তাম্বুলির বাস ছিল। তাঁহারা নগদ টাকার কারবার করিতেন। বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতেন। তাঁহাদের নিকট যে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হইত তাহা আর কস্মিন্‌কালে খালাস হইত না বলিয়া, লোকের একটী সংস্কার হইয়াছিল। এই জন্য কেহ নিতান্ত বিপদে না পড়িলে, তাঁহাদের টাকা কর্জ্জ করিতেন না। খুড়া দেবেশ বাবুর নিকট হতাশ হইয়া, কট্ কোবলা লেখাইয়া, তাহাদের বাড়ী হইতে চারিশত

টাকা কর্জ্জ লন। এই বাটীর কর্ত্তা নবকার্ত্তিক দত্ত, কতক ন্যায়ে কতক অন্যায়ে অর্থ রাশি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এক কপর্দ্দক সঞ্চয় ছিল না, ভিক্ষুকগণ মুষ্টিভিক্ষা পাইত না; কিন্তু "বনং ব্রতোতের" কালেও ইন্দ্রিয় সেবায় সমর্থ থাকিবেন বলিয়া বহুমূল্য উত্তেজক ঔষধ নিয়তই সেবন করিতেন।

খুড়ার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহেরা দুই সহোদর। তাহার অন্যতরের নাম রঘুমণি ঘোষাল। সেই রঘুমণির বংশে রাখাল দাস নামে একটিমাত্র বিংশতি বর্ষীয় যুবা ছিল। রাখাল বালক কালেই পিতৃহীন হন। সন্ততি বৎসলা জননী পুত্রকে লেখা পড়া শিখার ক্লেশ দানে নিতান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। এই জন্য রাখাল দাসের সেটি ঘটে নাই। পরিবার তিনটি মাত্র; আপনি, ভগ্নী এবং জননী। উদ্বাস্তুর অধিকাংশে প্রজা বিলি ছিল। রাখালের মাতা পাকা গৃহিণী, ঐ সকল প্রজাগণের গৃহ হইতে তরীতরকারী লইয়া প্রায়ই বাজার খরচটা বাঁচাইতেন। রাখাল খাজনা আদায় উপলক্ষে প্রজাগণকে প্রহার করিয়া "হস্ত-সুখ" অনুভব করিতেন। মহিষাদল অঞ্চলেও কিছু খাজনা ও ধান্য পাওয়া যাইত। রাখাল দুই এক বৎসর অন্তর তাহা আদায় করিয়া আনিতেন। কিন্তু কখন তাহা বাড়ীতে ইরসাল্ করিতে শুনা যায় নাই। রাখালের গানের দল ছিল এবং শুনা যায় রাখালের দ্বারা পল্লীস্থ কোন ভদ্র মহিলার দুর্নাম রটনা হয়। রাখাল, জননীর এক মাত্র আদরের সন্তান। এই জন্য জননীর নিতান্ত ইচ্ছা, শীঘ্র রাখালের বিবাহ দিয়া বধূমাতার মুখ দর্শন করেন। কিন্তু ধনাভাব ও জনাভাব বশতঃ এ পর্য্যন্ত সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। সম্প্রতি কোন স্বজনের সাহায্যে ও ঋণ

দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখালের বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়াছে! ভগ্নীটী, পূর্ব্বেই কুলীন পাত্রে অর্পিত হইয়াছিল। খুড়াই রাখালের বাড়ী ঘর বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া দিয়া ঐ স্বজনোচিত কার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

রাখাল বিশেষ সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইলে এবং পিতা বর্ত্তমান থাকিলে কন্যা, দানে পাইবার সম্ভাবনা ছিল। এ অবস্থায় কন্যা-রত্ন বিনামূল্যে পাওয়া যায়, তাঁহার এরূপ বংশ মর্য্যাদা ছিল না। পণ লাগিবে, আবার অনেক টাকার আভরণ দিতে হইবে। সম্বন্ধ উপস্থিত। কন্যার বয়ঃক্রম দ্বাদশেরও কিছু বেশি,—পরমা সুন্দরী।

রাখাল দাসের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইলে হাজার টাকা পণ দিলে বিবাহ নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইবে। কন্যা পক্ষীয়েরা একটু হাতের লেখা দেখিতে চাহিলেই সর্ব্বনাশ! এই জন্য খুড়া পূর্ব্বেই সতর্ক হন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মুন্‌সি মহাশয়।

আজ রাখাল দাসের বাড়ীর সমৃদ্ধির সীমা নাই। দুই এক জন প্রতিবেশিনী বাড়ীর মধ্যে পান জলখাবার গুছাইতেছেন এবং এক এক বার বহির্বাটীর প্রতি গুপ্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিতে-ছেন। জননী মহা ব্যস্ত। মুখে হাসি ধরিতেছে না। যে আসিতেছে, তাহাকেই মহা সমাদরে আহ্বান করিতেছেন। অন্য লাগিলেন,— কথা কহেন না, আজ তাহাকে আদর

"হস্তাক্ষর দর্শনে আপনাদের একটু বিলম্ব হইতেছে দেখিতে

অপর এক জন বরপক্ষীয় কহিলেন,—

"বৃথাড়ম্বরের প্রয়োজন কি। যখন রায় বাবুদের বাড়ী পনোর টাকা বেতনে মুন্সিগীরি করিতেছে, আর কলিকাতার বাজার মামলা মোকদ্দমার ভার সকলই উহার উপর; তখন হাতের লেখার কথা তোলাই অন্যায়। বিশেষ হাতে হাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ছেলে, চাকরী

তাহাও ভাবিতে লাগিলেন। রাখাল বালককাল হইতে সাজ-সজ্জার যত পারিপাট্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাহার চূড়ান্ত করিলেন। বহির্বাটীতে গমনকালে বিস্মৃতিক্রমে তাঁহার ভগ্নী পশ্চাতে ডাকিয়া ছিল। তাহাকে একটী চড় ও ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং দুই চারিটি গালি (বাপান্ত প্রভৃতি) দিয়া দর্শনার্থিগণের নিকট গমন করিলেন। ভক্তিভাবে প্রত্যেককে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

বর ও কন্যাপক্ষীয় অনেক গুলি লোক একত্র উপবিষ্ট। এক জন বরপক্ষীয়, খুড়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"রাখাল বড় সৎপাত্র।" খুড়া কহিলেন,—

"রাখাল, রায়হাটের রত্ন, বয়সে কাঁচা হইলেও, বুদ্ধি-বিবেচনা ও উত্তম দৃষ্টান্তে আমাদের অপেক্ষাও পরিপক্ক।" কন্যা পক্ষের এক জন কহিলেন,—

"যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে অনাবশ্যক হইলেও পাত্রের হস্তলিপি দর্শন ও দুই একটী বাক্য শ্রবণ করা এ কার্য্যের রীতি। অতএব একটা দোয়াৎ কলম আনাইয়া দিন।"

"তাহার আর সন্দেহ কি। যাহার

পাল্টা হইল বলিয়া খুড়া গোপনে তাঁহার গা টিপিলেন। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে এক জন লাঠিয়াল দ্বার হইতে,—

"মুন্‌সি মোশাই, বড় বাবু আপনারে ডাক্‌চেন, শীগ্‌গির আসেন, সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে বলেছেন।" এইরূপে ডাকিতে লাগিল। খুড়া কহিলেন,—

"রাখাল, বিলম্ব করিওনা, বড় বাবু বড় কড়া।"

মুন্সি মহাশয় সত্বর হইয়া লাঠিয়ালের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খুড়া রাখালকে পাত্র দর্শনার্থি-গণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার বাসনায় সতর্ক ছিলেন। রাখালের সুচরিত্র খ্যাপনার্থ কয়েক জন প্রতিবেশীকে উপদেশ দিয়া রাখেন। এক জন লাঠিয়াল, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া আত্ম-গোপন পূর্ব্বক দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। খুড়ার মুখে দোয়াৎ কলমের কথা শুনিবামাত্র সে রাখালকে মুন্সি মহাশয় বলিয়া ডাকিল। পাত্র দর্শন নাটকের এই সকল অংশ যথারীতি অভি-নীত হইলে, খুড়া "স্ত্রীনর্ম্মবিবাহেষু" স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"হস্তাক্ষর দর্শনে আপনাদের একটু বিলম্ব হইতেছে।"

অপর এক জন বরপক্ষীয় কহিলেন,—

"বৃথাড়ম্বরের প্রয়োজন কি। যখন রায় বাবুদের বাড়ী পনোর টাকা বেতনে মুন্সিগীরি করিতেছে, আর কলিকাতার বাজার মামলা মোকদ্দমার ভার সকলই উহার উপর; তখন হাতের লেখার কথা তোলাই অন্যায়। বিশেষ হাতে হাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ছেলে, চাকরী

করে এবং বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করে, পূর্ব্বে সে কথা কন্যাকর্ত্তা মহাশয়দিগকে বলা হইয়াছে। এখন মিষ্টান্নের আয়োজন করিয়া লগ্নপত্র স্থির করাই বিহিত।" কন্যাকর্ত্তাগণ অপ্রতিভ হইয়া এই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। অন্যান্য বরপক্ষীয় ও সমাগতগণ সকলেই উহাতে অনুমোদন প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে, নির্দ্দিষ্ট দিনে রাখাল দাসের বিবাহ হইয়া গেল। নব বধূ স্বামীর ঘর করিতে আইলেন। বউমা পাইয়া রাখাল দাসের জননী সুখিনী হইলেন। "বউটি বড় লক্ষ্মী, মুখে কথা নাই, খুব কর্ম্মিষ্ঠা—সকলকে দয়া শ্রদ্ধা করে।" পাড়ায় নব বধূর এই রূপ সুখ্যাতি প্রচার হইল। রাখাল দাস সুন্দরী ও বয়স্থা বধূ পাইয়া সুখী হইলেন।
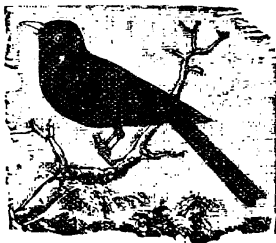
ষষ্ঠ অধ্যায়।

এ লোকটা কে?

রায়হাটে রথের বড় সমৃদ্ধি। তথায় অনেকগুলি বড় মানুষের বাস। প্রায় সকল বাড়ীতেই রথ হইত। বিশেষতঃ রায় বাবুদিগের রথের উৎসব, রায় হাটে ধরে না। মহোৎ-সবের অন্ন, ভূমিতলে রাশীকৃত হইয়া একতলা ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চ হইত। নেড়া নেড়ীর "ভাবপূর্ণ" গানের চীৎকারে এবং গঞ্জনীর পটা পট্ শব্দে আটদিন কাণ পাতা যায় না। মহোৎ-সবের অন্ন-ভোজনার্থী অনাহূত লোকদিগকে আট দিন প্রাতে তৈল জলখাবার দেওয়া হইত। তজ্জন্য বর্ষাকালীন পথের ন্যায় বাবুদিগের দরজায় তৈল ও মুড়ির কাদা হইত। রায়-হাটের প্রায় কাহার বাড়ী রথের আট দিন হাঁড়ি চড়িত না। বাবুদিগের রথের মহোৎসব জন্য আট দিন রায়হাটের বাজারে কেহ এক পয়সার তরী তরকারী ক্রয় করিতে পাইত না; তদ্ব্য-তীত বৈদ্যবাটী হইতে প্রতিদিন শেষরাত্রে দুইখানি তরকারী

বোঝাই নৌকা রায়হাটের ঘাটে আসিয়া লাগিত। রথের সময় যেখান হইতে যত গাইয়ে গুণী আসে, কেহই ফেরে না; তন্মধ্যে ভাল গাহনা বাজনা বাবুদিগের নিজ বাটীতে হয়। অবশিষ্ট গ্রামের অন্য অন্য স্থানে বিলি করা হয়। গ্রামের যে কোন ব্যক্তির নিকট বসিবার আসন, এক কলসী তেল, গোটা কত মসাল ও কিছু টাকা দিয়া সামান্য গোচের যাত্রা বা পাঁচালীর দল সকল পাড়ায় পাড়ায় বিলি করা হয়। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রায়হাটের প্রায় সকল বাড়ীই রথ হয়। গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গাতীরে এক প্রশস্ত ক্ষেত্র। উহাকে রথ ডেঙ্গা বলে। যত বড় বড় রথ ঐ স্থানে থাকে। রথের প্রথম দিন ও পুনর্যাত্রার দিন ঐ স্থানে মেলা হয়। ঐ মেলায় ২০।২৫ খানি গ্রামের লোক জুটে। কত প্রকার দ্রব্যের কত দোকান বসে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা যে বারের কথা কহিতেছি, সেবার আষাঢ় মাসের ২৩এ প্রথম রথ হয়।

অপরাহ্ণ ৬টা বাজিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইবার এখনও একটু বিলম্ব আছে। রথতলার দোকান সকলের চারিদিকে এত লোক, যে দোকানের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিতে হইয়াছে। চুড়িওয়ালারা চুড়ি পরাইবার জন্য যুবতীগণের হস্ত, আপ[illegible] উরুদেশে রক্ষা করিয়া বেচা কেনার লোকসান পোষাইয়[illegible] লইতেছে। যুবতীগণের চক্ষে জল আসিয়াছে, হাতের ছাল উঠিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে, তবু আরও একটু "আঁটো" হইলে ভাল হয়। কেহ বা গত বর্ষের গীল্‌টির নথটি বদলাইয়া আর একটি নূতন লইবেন, কিন্তু পছন্দ না হওয়ায় এক এক বার সকল দোকানেই পদার্পণ করিতেছেন। তেলা মাথায় বাঁকাতি কাটা, কোমরে

চাদর বাঁধা, বাকসের মালা গলায়, হাতে সরু বেতের ছড়ি, যুবকগণের অন্য কাজ নাই ; কেবল মনোহারীর দোকানে দোকানে গোল করিতেছে। জনতার গোলমাল,বালক বালিকার রোদন, পটকার চটাপট শব্দ, দস্তা বাঁশীর কঠোর নিনাদ দোকানদারের আহ্বান, রথাকর্ষণকারিগণের সমবেত করতালি, মধ্যে মধ্যে ঢোল ও খোলের বাদ্য একত্র মিশিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার কোন পল্লী-নাগর, "ডবলপয়সারে তোর পেট মোটা" সোজা বাঁশীতে এই গান ধরিয়াছেন। কাঁটাল, আনারস, ফুটি, পাকা কলা, পচামাচ, মালদয়ে আম, পোড়াবারুদ, সমাগত লোকদিগের শরীর ঘর্ম্ম, এই সকলের মিশ্র গন্ধ বহন করিয়া বায়ু, এক একবার সকলকেই সম্ভাষণ করিতেছেন। জনতা এত নিবিড়, তন্মধ্যে একজন লোকের প্রবেশ অসাধ্য। কিন্তু বাবুদিগের ঘোড়ার গাড়ী,—দেখিতে দেখিতে তথায় উপস্থিত। গাড়ীর উভয় পার্শ্বে যেখানে একজন লোক দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, সেখানে দশজন লোককে আশ্রয় লইতে হইল। ঠেলা ঠেলিতে পড়িয়া গিয়াও নিস্তার নাই, এক জনের উপর দশ জন পড়িল। ইতিমধ্যে রথতলা হঠাৎ অন্ধকারে আবৃত হইল। বাতাস অল্প শীতল হইল। সকলে চকিতলোচনে চাহিয়া দেখিল, পশ্চিম গগনের এক পার্শ্বে এক খানি নীলবর্ণের মেঘ উঠিয়াছে। মেঘ খানি জলভরে টল টল করিতেছে। সকলে পলাইতে আরম্ভ করিল। মহা গোলযোগ উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল। ময়রার দোকানে "ফলাহারের" সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত। ময়রারা কিরূপে "ফলাহারের" দোকান লইয়া বাড়ী পৌছিবে, তাহাই ভাবিতেছে। দোকানী

পসারি ব্যতীত রথতলায় অপর লোক প্রায় রহিল না। মেঘের অন্ধকারের সহিত সন্ধ্যার অন্ধকার যোগ দিল। ক্রমশঃ দোকান-দারেরাও একে একে দোকান পাট লইয়া প্রস্থান করিল। "প্রাণনাথ ঘরে এলো গো"—এইরূপ কীর্ত্তন গাইতে গাইতে বাবুরা রথ হইতে ঠাকুর নামাইয়া ঘরে গেলেন। ক্ষণকালের মধ্যে তাদৃশ জনতা, কোলাহল ও উৎসব পূর্ণ রথতলা নীরব ও জনশূন্য হইল। আকাশে নক্ষত্র নাই. বড় বড় দোকানদার-গণের দোকানে যে দুই চারিটি আলোক ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। এই অবসরে দুই একটি শৃগাল নিঃশব্দে আসিয়া কলারের প্রসাদ পাইতে আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রায় ৯টা। এমন সময়ে কাদার উপর মানুষের পায়ের শব্দ হইল। ক্ষণিক বিদ্যুৎ স্ফুরণে দৃষ্ট হইল. একজন বাক্সওয়ালা গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছে। কলিকাতায় যে সকল দাড়ী-ওয়ালা বাঙ্গাল মুসলমান বাক্স মাথায় গীল্টির গহনা ও অন্য অন্য জিনিস ফেরি করিয়া বেড়ায়, এই বাক্সওয়ালার চেহারাও ঠিক সেইরূপ। প্রায় এক ঘণ্টা দোকানদারের গোল ঘুচিয়াছে। এ এতক্ষণ কোথায় ছিল? বাক্সওয়ালা রথতলা ত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

মালিনীর অদৃষ্ট।

বিবাহকালে রাখাল দাসের স্ত্রীর বয়স দ্বাদশেরও অধিক হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং রাখাল দাস অল্পদিনের মধ্যেই কতকগুলি সন্তানসন্ততির জনক হইলেন। প্রথমে একটি পুত্র হয়। রাখাল দাস জননীকে বলেন,—

"মা, আমার ছেলের ভাতে জাঁক করিতে হইবে। বউ কিছু বলেনা বটে, কিন্তু প্রথম ছেলেটির ভাতে দশ টাকা খরচ করিলে সে অবশ্যই খুসী হইবে। লোকে বলে, তোমার হাতে অনেক টাকা আছে। তুমি এ পর্য্যন্ত তাহার এক পয়সাও আমায় দেও নাই। আমার বিয়েতেও কিছু খরচ কর নাই।" রাখাল দাসের মাতা শক্ত মেয়ে। বাস্তবিক তাঁহার হাতে অনেক টাকা ছিল। কিছুই খরচ করিতেন না। বরং নানা কৌশলে তাহা বৃদ্ধি করিতেন। কিন্তু তাহার এক পয়সা বাহির করিতে, রাখাল কেন, রাখালের পিতারও ক্ষমতা ছিল না। জননী রাখাল

দাসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ছেলের ভাতে জাঁক করিতেই হইবে। রাখাল মহিষাদলের বিষয় বিক্রয় করিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

লোকের চরিত্র যতই কেন উচ্ছৃঙ্খল হউক না, সংসারে স্ত্রী পুত্র থাকিলে তাহার একটি বন্ধন থাকে। বিশেষতঃ স্ত্রী সুন্দরী ও প্রিয়বাদিনী হইলে তাহার সংসারবন্ধন আরও প্রবল হয়। সেই স্ত্রীকে সুখে রাখিবার জন্য পুরুষ প্রাণপণে অর্থাদি উপার্জ্জন করেন ; এই জন্যই "স্ত্রী ভাগ্যে ধন" ইত্যাদি প্রবাদ আছে। যাহা হউক, ঐ বন্ধনে মানুষকে অনেকটা সংযত করিয়া রাখে। লোকচরিত্রের উপর সন্তানপালনী প্রকৃতির এত অধিক প্রভুত্ব যে. প্রায় তাহা অতিক্রম করা যায় না। রাখাল দাসের স্ত্রীর নাম মালিনী। মালিনী বড় লক্ষ্মী। মালিনী মনঃক্লেশে মলিনা হইতেন, কিন্তু মুখে ও কার্য্যে রাখাল দাসের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অভক্তি ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেন না। পতি যেমনই হউন, স্ত্রীলোকের পরম গুরু, মালিনীর ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি মিষ্ট কথা ও সদুপদেশে রাখালকে সতত সুখী করিতেন। স্ত্রীর এই সকল গুণে রাখাল এত বশীভূত হন যে, যাবজ্জীবন তাঁহার কথা শুনিবেন এবং তাঁহাকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করেন। এই জন্য তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি, ক্রমে দূর হইতে লাগিল।

মহিষাদলের বিষয় টুকু বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় রাখালের আর বাবুগিরি হয় না। উদ্বাস্তুর উৎপন্নে সংসার চলাই ভার। এখন আরও ব্যয় বেশী। রাখালের তিন চারিটি কাচাঁ কচি। বড়টি পাঠশালে লিখিতে যায়। পালি পার্ব্বণ, রোগশোকে, ক্রমে

খরচ বাড়িতেছে। ভগ্নীপতিটি প্রায়ই আসেন। তিনি কুলীনের সন্তান হইলেও নিতান্ত অপাত্রতা নিবন্ধন তাঁহার আর বিবাহ হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে রাখালের বাটীতে, প্রায়ই আসিতে হয়। আপনার স্ত্রীকে নিজ বাড়ী লইয়া গিয়া সংসার ধর্ম্ম করেন, তাঁহার এরূপ সঙ্গতি ছিল না। তাঁহার নাম ভীম, বয়স প্রায় পঁচিশ। মুখে দাড়ী গোঁপ মোটে নাই। বর্ণ গৌর। গণ্ডে কতকগুলা ব্রণের দাগ। প্রতিদিন তিন ছিলুম গাঁজা বরাদ্দ আছে। রাখাল দাসের দিন দিন খরচ বাড়িতেছে। পাঠক! অবগত আছেন, তাঁহার বিবাহের সময় ভিটাবন্ধক রাখিয়া অনেক টাকা কর্জ্জ করা হয়। দীর্ঘকালে সে টাকা শোধ হইল না। আসলের উপর সুদ বাড়িতেছে। রাখাল ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া মহাজনেরা টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মহাজনেরা প্রথমে কয়েক জন ভদ্র লোকের অনুরোধে পড়িয়া রাখালকে তাঁহাদের নিজ বাটীতে একটি তাগীদগিরের কর্ম্ম দেন। বেতন ৮৲ টাকা। কথা এই ছিল, বেতন হইতে যৎকিঞ্চিৎ রাখালকে দিয়া অবশিষ্ট সুদের হিসাবে বার হইবে। রাখাল সেইরূপে সেই কাজ করিতে লাগিলেন। আপনাকে, কি আপনার পরিজনদিগকে বিপদে ফেলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাঁহার লোভ সংবরণেরও ক্ষণিক ইচ্ছা দমনের শক্তি, কিছু মাত্র ছিল না। কোন সময়ে কতকগুলি আদায়ী টাকা আত্মসাৎ করিয়া, স্ত্রীর কয়েকখানি বন্ধকী আভরণ খালাস করিয়া দেন। মহাজনেরা এই সূত্র পাইয়া আদালতের সাহায্যে তাঁহার পৈতৃক বাড়ী ও যাবতীয় জমিজ্জারাত আত্মসাৎ করিয়া

লন। রাখাল দাস সর্ব্বস্বান্ত ও পুরাতন বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়া যৎসামান্য দুইখানি খড়ুয়া ঘরে বাস করিতে বাধ্য হয়েন। নানাবিধ উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা অতি কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রথের দিন পাড়ার বালক বালিকারা নূতন কাপড় পরিয়া, কাপড়ের এক খুঁটে পয়সা বাঁধিয়া,প্রাচীনা অভিভাবিকার সহিত রথ দেখিতে চলিল। তাহা দেখিয়া রাখালের ছেলেরাও পয়সার জন্য জননীকে বিরক্ত করিতে লাগিল। রাখাল ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে বিদেশে গিয়াছিলেন। কথা ছিল, যেখানেই যাউন, রথের পূর্ব্ব দিন বাড়ী আসিবেন। এই জন্য মালিনী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এ বিপদে পড়িতে হইবে না। আজ তাঁহার হাতে পয়সা নাই। কাহার নিকট হাত পাতিয়া দুই চারি আনা ধার করিতে, তিনি জানিতেন না। ছেলেপুলের হাতে পয়সা দিতে না পারিয়া মনে বড় ক্লেশ হইল। আপনার আভরণহীন অঙ্গ প্রতি চাহিয়া চক্ষে জল আসিল, সেই জল বিগলিত হইবার পূর্ব্বেই মুছিয়া ফেলিয়া, "বৈকালে তিনি বাড়ী আসিয়া তোমাদিগকে পয়সা দিবেন।" বালকগণকে এইরূপ কহিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাখালের জননী করেন কি, অনেক বকিয়া ঝকিয়া আজ তাঁহাকে আনা দুই খরচ করিতে হইল। রাখালের সন্তানাদি হওয়ার পর হইতে কখন কখন জননীকে এইরূপে কিছু কিছু দণ্ড দিতে হইত। যাহা হউক, বালকদিগের গোল চুকিয়া গেল, ক্রমে দিবাবসান হইল। সন্ধ্যার পর দুই শাশুড়ী বউয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। প্রদীপ জ্বালিয়া গল্প করিবার অবস্থা নহে; এজন্য তাহা উর্দ্ধমুখ।

ঘর অন্ধকার-প্রায়, দ্বার রুদ্ধ। সুখের দুঃখের কত কথা হইতেছিল। কথায় কথায় মা ঠাকুরাণী কহিলেন,—

"বাছারি আমার সোণার বরণ কালী হয়ে গিয়েছে। একেবারে দুদিন বাড়ীর ভাত খেতে পায় না। অষ্টপর এগাঁ—সে গাঁ ঘুরে বেড়ায়। কাল আস্‌বে বলে আজ সাত দিন বাড়ী ছাড়া; কই! আজ এখনও ত বাড়ী এল না। ছেলেবেলা বিয়ে করেই বাছার আমার এত কষ্ট—" মালিনী এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কহিলেন,—

"মা, বিয়ে করেই তাঁর এত কষ্ট, তার ভুল নেই, কিন্তু তোমার ঘরে এসে আমিই কি বড় সুখী হয়েছি? তাঁর দুঃখে আমার কত দুঃখ, তা—" মালিনী আর কিছু বলিলেন না। নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। স্তিমিত দীপের বিন্দুবৎ দুইটি প্রতিবিম্ব, তাঁহার উভয় কপোলে দীপ্তি পাইতে লাগিল। মা ঠাকুরাণী আবার আরম্ভ করিলেন,—

"বাছা, তিন ছেলের মা হলে, আজ ও ছেলে বুদ্ধি ঘুচ্‌লো না। সুখ দুঃখ কপালের কথা। কপালে থাকিলে, আমার ঘর থেকেই তোমার সুখ হতো। রায়েদের ছোট বউর সুখ হয় না কেন? ভাল খাওয়া,—ভাল পরা,—দাসদাসী,—মাটিতে পা দিতে হয় না—তবু যে সে সদা অসুখী। আমাদের যে, এত নেই, নেই,—তবু ত এক দিনও উপোস কত্তে হয় না। আর সে সাত উপোসে একদিন খায়। বল দেখি, কিসের অভাবে তার এত কষ্ট?"

পাঠকের পূর্ব্বপরিচিতা কপালিনীই রায়েদের ছোট বউ। কপালে না থাকিলে সুখ হয় না, মালিনী তাহা

জানিতেন; তবু শাশুড়ীর কথায় মনে দুঃখ হইল; একটু রাগও হইল। উত্তর করিবেন কিনা ভাবিতেছেন ইতিমধ্যে "দুওর খোল" বলিয়া বাহির হইতে কে দ্বারে আঘাত করিল। মালিনী শশব্যস্তে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহের এক কোণে দাঁড়াইলেন। মা ঠাকুরাণী দ্বার উদ্ঘাটন করিলে, রথতলার শ্মশ্রুধারী বাক্স-ওয়ালা গৃহে প্রবেশ করিল।
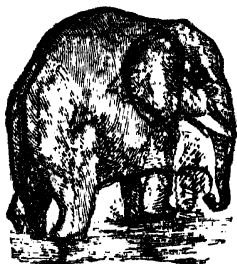
অষ্টম অধ্যায়।

মৃত্যু ?

কলিকাতা হইতে বৰ্দ্ধমান যাইবার যে হাঁটা পথ আছে, সে পথ, পাণ্ডুয়ার নিকট কোন স্থানে পশ্চিমের রেলের পথকে কাটিয়াছে। উভয় পথের ঐ সংক্রমস্থল হইতে কিয়দ্দূর পশ্চিম দিকে গমন করিলে, বামভাগে একটি পুষ্করিণী দেখা যায়। পুকুরের উত্তর পাড়ে একটি প্রকাণ্ড বট গাছ আছে। তত বড় বট গাছ সচরাচর দেখা যায় না। তাহার সুদীর্ঘ শাখা সকল, বৃক্ষ মূল হইতে ত্রিশ চল্লিশ হস্ত দূরে ভূমি স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। শাখা সকল শরীরের দীর্ঘতা ও গুরুভার প্রযুক্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া, মধ্যে মধ্যে এক একটী আস্থানিক মূল বা বটের বোয়া, স্তম্ভের কার্য্য করিতেছে। কাণ্ডগাত্রের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কোটর। তন্মধ্যে নিশাচর পশু পক্ষ্যাদি লুক্কায়িত থাকে। রাখালেরা অদূর প্রান্তরে পশুপাল ছাড়িয়া ঐ বটচ্ছায়ায় খেলা করে। কেহ বা নমনশীল শাখায় আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণের সুখভোগ করে। কোন রাখাল শাখান্তরে

রজ্জু লম্বমান করিয়া "দোলম্‌পাক্" খায়। কেহ বা অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ শাখাটি অধিকতর প্রণমিত করিয়া প্রিয়তম মেষশাবককে পাতা খাওয়ায়। অনেকগুলি পক্ষী, নীড় নির্ম্মাণ করিয়া ঐ বৃক্ষে বাস করে। এতদ্ব্যতীত বহুতর উদাসীন পক্ষী রাত্রিকালে উহার আশ্রয় লয়। এজন্য ঐ তরু দিবারাত্র পক্ষিকুল-কলরবে পর্য্যাকুল থাকে। বসন্তকালে ঐ উদাসীনগণেরও কেহ কেহ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শাখাশিখরে স্থির স্বত্ব স্থাপন করে। এই গাছের "গৃহস্থ" পক্ষিগণের একটী বিষম বিপদ আছে। কোটরে কতকগুলি সর্প বাস করেন। তাঁহাদের চরিত্র বড় ভাল নহে। তাঁহারা কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে পরাঙ্মুখ। সুতরাং অবসর মতে পক্ষিদের ডিম্বশাবক চুরি করিয়া উদরপূর্ত্তি করাই সহজ জ্ঞান করেন। অধ্বক্লান্ত পথিকেরা উহার মূলে বিশ্রাম করে। কেহ কেহ রাঁধিয়া খায়;—লোষ্ট্র নির্ম্মিত চুল্লী ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দগ্ধ হাঁড়ী সকল, তাহার পরিচয় প্রদান করে। তরুমূলের এক পার্শ্বে একখানি বৃহৎ প্রস্তর, পঞ্চানন ঠাকুরের প্রতিনিধি স্বরূপে স্থাপিত আছেন। নিকটস্থ গ্রামবাসীরা ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া মাননী চুল দিয়া আসে। ঠাকুরের লোষ্ট্র রূপিণী "মোহিনী" মূর্ত্তি, সেই চুলে ঢাকা থাকে। পূর্ব্বে ঐ পঞ্চানন ঠাকুরের নিকট মহিষ বলি হইত; কারণ কয়েকটী বিশাল বিষাণ-সংযুক্ত মহিষমুণ্ড ঐ স্থানে দৃষ্ট হয়।

নিকটস্থ পুষ্করিণীর জল অগাধ ও স্বচ্ছ। মাঝে মাঝে পদ্মফুলের গাছ আছে। ফুলগুলি যেমন ফুটে, তেমনি শুকায়,—কাহারও তুলিতে সাহস হয় না।

পুকুরের পূর্ব্বভাগের অধিকাংশ, দামে ঢাকা; কারণ সেদিকে

ঘাট নাই। কেবল বটগাছের দিকে একটি ঘাট আছে, পথি-কেরা সেই ঘাট ব্যবহার করে। দূরাগত পথিক ব্যতীত, নিকটস্থ গ্রামিকেরা তথায় জল গ্রহণ, কি স্নানার্থ কখনই আসে না। কারণ পুকুরের নাম "পেত্নী পুকুর"। গঙ্গা, দূর বলিয়া সকলে সেই পুকুরপাড়ে শবদাহ করে। পুকুরবিষয়ে গ্রামিক-গণের এইরূপ সংস্কার আছে যে, "ঐ পুকুরে যে নামে, সে আর উঠে না।" পুকুরের ধারে ধারে দুই চারিটী নরকপাল ও অস্থিময় হস্তপদাদি, প্রায়ই দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ঐ পুষ্করিণীর তীরে মধ্যে মধ্যে দুই একজন পথিক, দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত, গ্রামবাসিগণ তাহাও অবগত ছিল।

রথের দিন মধ্যাহ্ন কালে ঐ বট তলায় একখানি পালকী উপস্থিত হইল। বাহকেরা, পালকী নামাইয়া, গামোছার বাতাস খাইতে খাইতে একটু দূরে গিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণপরে আর কয়েকজন বাহক ও একটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। পালকী আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই একটি গ্রাম্য হস্তী ঐ স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়া ছিল। মাহুতেরা পুকুরের পাড়ে আহা-রাদির উদ্যোগ দেখিতেছে। হস্তী, মনের সাধে বটের ত্বক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ফল পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিতেছেন। কাষ্ঠ চর্ব্বণের মড়মড় শব্দ, কর্ণের বাতাসে উড়াইয়া দিতেছেন। পশ্চাদ্বর্ত্তিনী স্ত্রীলোকটী যান-মধ্যবর্ত্তিনীর দাসী। দাসী নিকটে গিয়া কহিল,—

"বেলা অনেক হয়েছে,—বেয়ারারা এবেলা আর যাবে না। এইখানে নাওয়া খাওয়া কর্‌বে। তুমি কি খাবে?" যানস্থা উত্তর করিলেন,—

"কিছুনা।"

"বাপ্‌রে, তাকি হয়! পোয়াতি মানুষ! কিছু খাবে বইকি!"

"বাড়ী যাব কখন?"

"তার অনেক দেরি, হয়ত রাত্‌ পুয়ে যাবে।"

"তবে একটু মুখ ধোবার জল দে।"

দাসী জল আনিতে গেল। কর্ত্রী, যানের আবরণ বস্ত্র উত্তোলিত করিয়া, যতদূর দৃষ্টি গেল, দেখিতে লাগিলেন। দূরস্থ একজন পথিককে, তাঁহার পালকীর অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, আবরণ বস্ত্র ছাড়িয়া দিলেন। দাসী একেবারে স্নান করিয়া কয়েকটী সনাল কুমুদ ফুল হস্তে জল আনিয়া উপস্থিত করিল। দাসীর মা ঠাকুরাণী কুমুদ মৃণালের মালা গলায় দিতে বড় ভাল বাসেন। এই জন্য দাসী ফুল আনিল। কর্ত্রী ভিতর হইতে অনুচ্চস্বরে কি বলিলেন। দাসী উত্তর করিল;—

"এক বামন, পুকুরে হাত মুখ ধুতে ধুতে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিল। আমি উত্তর দেইনি।" যান মধ্যস্থা সুন্দরী পালকীর দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। দাসী জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে কহিলেন;—

"লোকটীর চলন যেন ঠিক্ আমার দাদার মত।"

"এ মাঠের মাঝখানে তোমার দাদা কোথা থেকে এল?"

ঠিক দাসীর স্বর অনুকরণ করিয়া কর্ত্রী কহিলেন;—

"এ মাঠের মাঝখানে আমরা কোথা থেকে এলেম?"

আবার কহিলেন,—

"দাদা হয়ত আমাকে দেখতে যাচ্ছেন। যাবার কথাও ছিল।"

"ভাল! আমি এখনি সব সন্ধান নিচ্ছি। তুমি একটু জল খাও।"

"তুই যা সঙ্গে করে এনেছিস, তার কিছু আমাকে খাইতে দিস ত চোকের মাতা খাবি,—ও সব ফেলেদে! এখান থেকে কিছু এনে দিতে পারিস ত খাব!"

"কথায় কথায় চোক্ কাটেন,—আর ভালোর মাতা খান! আমার আছে কি? ভালোর মধ্যে এক রত্তি মেয়ে! সোয়ামী নেই,—পুত্ নেই! চোক ছরত আছে বলিয়া পরের বাড়ী গতোর খাটিয়ে খাই! তাও কি তোমার সয় না! একটা ট্যাকা দেও;—গাঁয়ের মধ্যে দেখে আসি।" দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামিনীর মিষ্ট কথার স্বাদ লইতেছে। স্বামিনী অন্তরে হাসিতেছেন, অধরোপরি দশন-চাপে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। ইতি মধ্যে একটা শৃগাল, অর্দ্ধভক্ষিত একটী মৃতশিশু, পেত্নী পুকুর হইতে আনিয়া পালকীর সম্মুখ দিয়া গমন করিল। তাহার প্রতি স্বামিনীর দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, দাসীর গায় হাত দিয়া শশব্যস্তে কহিলেন,—

"দ্যাখ্! দ্যাখ্! পেছনে তাকিয়ে দ্যাখ্।" দাসী পশ্চাদ মুখী হইয়াই "রাম! রাম!" শব্দে চীৎকার করিয়া,—

"কি বালাই! আজ কি যে কপালে আছে, তার ঠিক নেই! তোমার কি এগুনো দেখতে আছে? মা কালী মঙ্গল করুন। অদিনে,—অক্ষণে,—কার কথা না মেনে,—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অন্যমনস্কা হইল। মৃদু গম্ভীর "গুড় গুড়" শব্দ তাহার

কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বট গাছের প্রশাখা সকল অল্প অল্প সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দাসীর কথায় সুন্দরী মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। কহিলেন,—

"হোক্! হোক্! অদিনে অক্ষণে নামেনে, দাশুরায়ের ছড়াটা শেষ হোক্।"

"আমি বুঝি ছড়া বলছি? এখন হাসিখুসী রাখ। বুঝি ঝড় ওঠে।" দাসী এই কথা বলিয়া একটু দূরে গিয়া দেখিল; গগনে মেঘ ছুটিতেছে,—এক খানির পর একখানি,—তারপর আর একখানি, প্রবলতর পবনতাড়নে সজোরে ছুটিতেছে। মাঠে, ঘাটে, পথে, যে, যেখানে ছিল, মেঘ দেখিয়া গাছ তলায় দৌড়িয়া আইল। বৃষ্টির বড় বড় ফোটা, গাছের উপর "টপ্ টপ্" করিয়া পড়িতে লাগিল। মেঘ ক্রমেই নিবিড় হইতেছে। ক্ষণপ্রভা, ক্ষণে ক্ষণে দর্শককে চমকাইয়া দিতেছে। এই ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া দাসী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। স্বামিনীর নিকটস্থা হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিল। তিনি তাহাকে নিকটে বসাইয়া, এই অবস্থায়, এই স্থানে, কতদূর বিপদ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সকল শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ ভয়ানক আলোকে যেন সকলের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। স্বামিনী চমকিয়া চক্ষু মুদিলেন। পরক্ষণেই মস্তকের উপর বজ্র নিনাদ! গাছের উপর বজ্রাঘাত হইল!

গাছের উপর একটি প্রকাণ্ড বানর ছিল। সে শরবিদ্ধ বিহঙ্গবৎ তলস্থ করিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। হস্তী, যথাসাধ্য বজ্রনাদের অনুকরণ করিয়া প্রকাণ্ড দন্তদ্বয় ভূমিতে প্রোথিত করিল।

তরুতলাশ্রিত অনেকেরই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সকলের কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। দাসীর মূর্চ্ছা হয় নাই। কিন্তু বোধ হয়, তাহার কাণে তালা লাগিয়াছিল। কারণ ইহার পর সে যত কথা কহে, সকলই অত্যন্ত উচ্চস্বরে। বজ্রাঘাতের কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল, স্বামিনী পূর্ব্ববৎ পালকী মধ্যে বসিয়া আছেন। কিন্তু জড়বৎ বসিয়া আছেন। চক্ষু মুদিত দাসী ডাকিতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল,—মুখে কথা নাই। দাসী উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বাহকগণের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্র উপস্থিত হইল, অবশিষ্টেরা কে কোথায় গেল তাহার ঠিক নাই। তিন জনে ধরিয়া যানস্থাকে বাহিরে আনিল। শরীরে স্পন্দ নাই, মুখে কথা নাই!

নবম অধ্যায়।

গুপ্তবেদনা।

রায়হাটের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে। ঠিক প্রান্ত নহে, রেল রোডের পশ্চিমেও গ্রামের অনেক বসতি আছে। গ্রামে একটী মধ্য শ্রেণীর ষ্টেসনও আছে। পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গা। ষ্টেসন হইতে পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত পাকা পথ গিয়াছে। পূর্ব্বে গঙ্গা, উত্তরে রাস্তা; এই কোণে রায় বাবুদের বাটী ও পুরোদ্যান। পুরোদ্যানটি, গঙ্গা[illegible]ের ঠিক উপরেই অবস্থিত। উদ্যানের ভূমি, গৃহ, বৃক্ষা[illegible] নদীগর্ভসাৎ হইবার শঙ্কায় ঐ স্থানের তীরটি এরূপ দৃঢ়বন্ধ করা হইয়াছে যে বহু কালের খর স্রোতেও তাহার কণামাত্র স্খলিত হয় নাই। দক্ষিণ দেশীয় লোকেরা তাহাকে "পোস্তা" কহে। ঐ পাকা পোস্তার উপরেই কয়েকটী পাকা ঘর। ঘর কয়টী পরম রমণী সুগন্ধি ফুলকুলের পরিমলবাহী ও গঙ্গাসলিলশীকরসম্প

পবনসঞ্চারে সতত সুগন্ধি, সুশীতল। এই ঘরের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বারেন্দায় বসিলে উভয় দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত জাহ্নবীর লহরী লীলা অবলোকন করা যায়। কিন্তু ঐ ঘর কয়টী প্রায়ই বদ্ধ থাকে। দেবেশ বাবু কদাচিৎ উদ্যান ভ্রমণে গমন করিয়া, ঐ স্থানে বিশ্রাম করেন, এবং কালে কথন বিদেশ হইতে তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধু বান্ধব আইলে তাঁহাকে ঐ স্থানে রাখা হয়।

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র, তরুগণে অগণ্য খদ্যোত, ধরাতলে সংখ্যাতীত দীপাবলী। হীরকখচিত সুনীল চন্দ্রাতপ, গঙ্গার বিমল সলিলে প্রতিবিম্বিত;—প্রতিবিম্ব মৃদু পবন তাড়নে ঈষদান্দোলিত তরঙ্গ সহ ঈষদান্দোলিত। উদ্যানগৃহের যাবতীয় দ্বার ও বাতায়ন উদ্‌ঘাটিত। রজনীগন্ধার গন্ধবহ সন্ধ্যাসমীরণে গৃহস্থ আলোক শিখা বিকম্পিত। চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী ভিত্তিগাত্রে প্রকাণ্ড দর্পণচতুষ্টয় সংলগ্ন আছে। উহাতে সসামগ্রী সমস্ত গৃহ প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, ঐ ঘর চতুর্দ্দিকে চতুর্গুণ প্রতিফলিত হইয়াছে। গৃহমধ্যে পরিস্কৃত বিস্তৃত শয্যায় বাতায়ন নিকটে উপাধানের উপরে উরস্থাপন পূর্ব্বক জনৈক পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার নির্নিমিষ লোচনদ্বয়, গঙ্গাসলিলে সংসক্ত। হঠাৎ গাত্রোত্থান ও বহির্গমন করিয়া বারেন্দায় পাদ চারণা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিয়া আলমারি হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। পূর্ব্ববৎ শয়ান হইয়া পুস্তক খুলিলেন, একপাত, দুইপাত করিয়া শতাধিক পাত উল্‌টাইলেন। দেখিলে বোধহয়, পড়িতেছেন,—কিন্তু পড়িতেছেন না। অন্যমনস্ক। ঘরে গঙ্গাম্বু সঞ্চারী শীতল বায়ু অবিশ্রান্ত প্রবাহিত। তথাপি গৃহস্থিত

পুরুষের ললাটে স্বেদবিন্দু লক্ষিত হইতেছিল। অনুচ্চ স্বরে "গুরো" (তাঁহার ভৃত্যের নাম গুরুচরণ)। সে গৃহান্তর হইতে আসিয়া নীরবে তামাক দিয়া গেল। মেছুয়া বাজারের উৎকৃষ্ট তামাকু অঙ্গারের আগুণে পুড়িয়া পুড়িয়া বাতাসে সুগন্ধ বিস্তার করিল। বাবুর ঔদাস্য আমাদের বড়ই বিরক্তিকর। যিনি যাহাই বলুন, কিন্তু আমরা তাদৃশ স্থলে তেমন "কলিকা পাওয়া" সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

বাবু হুঁকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। যখন অপূর্ব্ব তামাক বিফলে পুড়িতেছিল, তখন তিনি পুস্তকের মধ্যস্থ এক খানি পত্র বাহির করিয়া শ্যামাদানের বাতিতে দগ্ধ করিতে ছিলেন। ঐ পুস্তকের মধ্যে কয়েক খানি পত্র ছিল। পত্রের কিয়দংশ বা সমগ্র একবার মাত্র পড়িয়াই দগ্ধ করিতেছিলেন। এই রূপে তিন খানি পত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গেল। চতুর্থ খানির শিরোভাগস্থ কয়েকপংক্তি পাঠ করিয়াই উঠিয়া বসিলেন। পত্রখানি দুই বার পাঠ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত আল্‌মারি হইতে লেখনীয় উপকরণ আনিয়া পুনর্ব্বার উপবেশন পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন। এই পত্র খানি, পাঠক মহাশয়কে একবার পাঠ করিতে হইবে। কারণ তৎসহ আখ্যায়িকার সংস্রব আছে।

"সখে নীলাম্বর,

অদ্য এই মুহূর্ত্তে তিন খানি পত্র দগ্ধ করিলাম। বড় জ্বালায় দগ্ধ করিলাম। ইচ্ছা ছিলনা, তোমর কাছে এপাপের কথা প্রকাশ করিব ; কিন্তু উদ্বেল অন্তঃস্রোতে কে বাধা দেয় ? যখন কপালিনী আমার শয্যা ত্যাগ করিয়া সিন্ধুক মধ্যে আশ্র-

গোপন পূর্ব্বক যামিনী যাপন করে, তখন মনে মনে স্থির করিয়া ছিলাম, আর হরিপাড়ায় যাইবনা, আর কপালিনী সহ মিলিত হইবার চেষ্টা করিব না। ঐ পত্র কয় খানি সেই সময়ের। ঐ গুলি, তখন আমার মনের মত উপদেশ দিয়াছিল। আমিও তখন বন্ধুগণের নিকট হইতে মনের ও সময়ের উপযোগী উপদেশ পাইয়া স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ ঐ পত্র গুলি ভাল লাগিলনা, পড়িতে পড়িতে গা জ্বলিয়া উঠিল, পোড়াইয়া ফেলিলাম।

আর একখানি পোড়াইতে পারিলাম না। পোড়াইব কি! বার বার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি নাই। সেখানি তোমার পত্র। কপালিনীর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলে, এখানি সেই পত্র। এই জন্যই পোড়াইতে পারিলামনা। যাহাতে কপালিনীর অহঙ্কার আহত নাহয়, তেজ খর্ব্ব না হয়, এই পত্রে আমাকে সেই রূপ উপদেশ দিয়াছিলে। তোমার সেই পত্র পাইয়া আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি। কপালিনীকে সাদরে গৃহে আনিয়া, যতদূর যত্নে রাখা যাইতে পারে, রাখিয়াছিলাম।

তুমি আমাকে প্রবোধ দিয়াছিলে, কপালিনীর দুই একটী সন্তান হইলে এত উগ্রভাব,—এত উদাসীন ভাব থাকিবেনা। তখন পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে, পরের নিকট বাধ্য হইতে সঙ্কোচ থাকিবে না। তখন সকলের মনে ব্যথা দিয়া কথা কহিতে,—সকলকে অপ্রিয় স্পষ্ট কথা বলিতে,—পরের তিল প্রমাণ অপরাধ তাল প্রমাণ করিয়া এক কথায় মুখের উপর দশ কথা শুনাইয়া দিতে প্রবৃত্তি হইবে না। তখন আত্মোপমায়

পরের দুঃখ বুঝিতে শিখিবে। তখন গুরুজনে ভক্তি,—আত্মীয় জনে প্রণয়,—ও পোষ্যবর্গে দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইবে। তখন স্বভাব সন্ততি-স্নেহে কোমল হইবে। অকারণে সহসা দুর্ব্যবহার বা দুর্বাক্যে শক্র বাড়াইতে সাহস করিবে না। এই সকল স্বভাবদোষ সারিয়া গেলে কপালিনী সংসারে আমার প্রধান ও প্রিয় সঙ্গিনী হইবে। তখন আমি উহারে লইয়া সুখী হইব। সখে, আমি তোমার এই সকল কথায় প্রবোধ পাইয়াছিলাম। অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া ছিলাম।

এই বিশ্বাসবশে কপালিনীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশেষতঃ এদিকে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার বিশেষ চেষ্টাই করিতে ছিলাম। যে হেতু তুমি অবগত আছ যে, কপালিনী সম্প্রতি পাঁচ মাস গর্ভিণী। কপালিনীর গর্ভসঞ্চার দর্শনে তোমার কথা মনে পড়ে। ভবিষ্যৎ সুখের আশা হয়। কিন্তু ভাই, সুখ আমার কপালে নাই। কপালিনী ক্রোধবশে, আজ প্রত্যূষে পিত্রালয়ে গমন করিয়াছে। অমি যাইতে বাধা দেই নাই। বরং স্বয়ং দাঁড়াইয়া বিদায় করিয়াছি।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী ত্যাগ করিলেন। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—

"অন্তঃপুরবাসিনী কোন নিরপরাধা কামিনীর সহিত কপালিনী অকারণে বিবাদ করে। তজ্জন্য আমি তাহাকে তিরস্কার করি। তখন আমার বোধ ছিল, কপালিনীরই সম্পূর্ণ অপরাধ, কিন্তু এখন দেখিতেছি, অপরাধ আমার, নতুবা এত জ্বালা হইবে কেন? কপালিনীর বিবাদকালীন একটা কথা মনে পড়ায়, মন ছাই হইয়া যাইতেছে,—আপনাকে যথার্থই অপরাধী

বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ রথের আমোদে রায়হাট ভাসিতেছে; কিন্তু আমি বিষদিগ্ধ গুপ্তশরে বিদ্ধ হইতেছি। আমি যখন তিরস্কার করি, কপালিনী বলিয়া ছিল,—"শত্রু হাসাইও না।" আমি বাড়ীর সকলের সমক্ষেই তিরস্কার করিয়াছিলাম। তাহাই তাহার অনিবার্য্য ক্রোধের কারণ। কপালিনীর অহঙ্কারে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছিলে। ইহা সেই নিষেধ অমান্যের ফল। এই জন্যই এই উপদেশযুক্ত তোমার পত্রখানি আজ বার বার পড়িতেছি।

এক দিক দিয়া কপালিনী বিদায় হইল, অন্যদিক দিয়া আমি বাগানে আইলাম। এখন বাগানেই আছি। যদি পার, শীঘ্র একখানি পত্র লিখ।

ত্বদীয়

শ্রীদেবেশ রায়—"

নীলাম্বর মিত্রের নিবাস কলিকাতা; দেবেশ বাবুর পরম বন্ধু। দেবেশ বাবু তাঁহাকেই পত্র লিখিলেন। দেবেশ বাবুর মনোদমনে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু স্বভাব গোপনের শক্তি ছিল না। কার্য্যানুরোধে সে শক্তির প্রয়োগে পরাঙ্মুখ ছিলেন না বটে, কিন্তু সে শক্তির সঞ্চারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রীতি হইত না। নানা কারণে স্ত্রী সহবাস সুখে এক প্রকার বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতে কখন তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তাদৃশী দুষ্টস্বভাবা স্ত্রীর পরিবর্ত্তে দারান্তর গ্রহণে তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি নিতান্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি কোন রূপেই তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। এজন্য তাদৃশ অমানুষ-চরিত্রা স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী

বলিয়া গুরুজন তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ অসন্তোষে তাঁহাকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইত। সংসর্গের ফলাফল, দেবেশ বাবু বিলক্ষণ অনুভব করেন। তিনি আত্ম-নাশ করিয়া কপালিনীকে প্রীত করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সর্ব্বদাই অকৃতকার্য্য হইতেন। কপালিনীর সহিত মতের অনৈক্য,—ব্যবহারের অনৈক্য সর্ব্বদাই ঘটিত। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা, পুরুষের ঔদার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সাংসারিক সুখ ও সৌকর্য্যের সৃষ্টি করে। এই সুখ ও সৌকর্য্যের স্থলে বিষম অনৈক্য। দম্পতির এরূপ অনৈক্য সংসারকে বিষময় করিয়া তুলে। দেবেশ বাবু এই বিষের জ্বালায় সর্ব্বদা জ্বলিতেন। কপালিনী রাগ করিয়া গেলেন, তাঁহার ক্লেশের সীমা নাই,—উদ্বেগের সীমা নাই। পাঠক! এইরূপে পিত্রালয়ে গমন কালে বটতলায় কোপনা কপালিনীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্মশানপ্রান্তরে বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন,—অসহায়া দাসী তাঁহাকে ধরিয়া রোদন করিতেছে।

দশম অধ্যায়।

এ আবার কি ?

যেমন এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেলে, মেঘের আর তাদৃশ ভার ও গম্ভীরতা থাকে না ; সেইরূপ নীলাম্বরকে পত্র লিখিয়া দেবেশ বাবুর অন্তর কিছু লঘু বোধ হইল। ঘড়িতে "ঠুন্—ঠুন্—ঠুন্—" করিয়া নটা বাজিল। তিনি এ বেলা বাড়ী যাইবেন, কি বাগানেই থাকিবেন, গুরুচরণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "এবেলা বাড়ী গিয়া আহার না করিলে, আমার ক্লেশ হইয়াছে ভাবিয়া মার মনে দুঃখ হইবে।" নিমিষ মধ্যে ইহা চিন্তা করিয়া দেবেশ উত্তর করিলেন, "যাব।" দেবেশ বাবু কখন তামাক চাহিতেন না। আজ একবার চাহিয়াছেন, আবার চাহিলেন। গুরুচরণ তামাক দিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গেল। অল্পক্ষণ পরেই দেবেশের বোধ হইল, গুরুচরণ গৃহপার্শ্বে কাহার সহিত কথা কহিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরতা প্রযুক্ত কথোপকথনের অর্থগ্রহ হইল না। কেবল গুরুচরণের একটি কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন ; কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। "সেই দিন ১২৩৲ টাকা আমায় গুণে দিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া গুরুচরণ প্রত্যাগত হইল। দেবেশ বাবুকে কহিল,—

"রাখাল ঠাকুর এয়েছে,—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।" দেবেশ উত্তর করিলেন,—

"রাখাল ঠাকুর কে? রাখাল ঘোষাল নাকি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

রাখালের বিষয় জানিবার জন্য দেবেশের পূর্ব্বাবধি কৌতূহল ছিল। সর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া রাখাল বিবাহ করেন, দেবেশের এরূপ ইচ্ছা ছিল না। কারণ রাখালকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বলিয়া জানিতেন। এই জন্যই তিনি [illegible] টাকা কর্জ্জ দিতে অস্বীকার করেন। এই জন্যই বিবাহের পর, রাখালের পরিণাম দেখিতে তাঁহার কৌতূহল ছিল।

গুরুচরণ রাখালের মাকে ধর্ম্ম মা ব[illegible]ছিল এবং অবসর মত রাখালদের বাড়ী যাইত, দেবেশ তাহা অবগত ছিলেন। এইজন্য কৌশলে গুরুচরণের নিকট মধ্যে মধ্যে রাখালদের সংবাদ লইতেন। আজ রাখালের সঙ্গে গুরুচরণের কি পরামর্শ হইতে ছিল, প্রকাশ্যে তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু জানিবার ইচ্ছাও বলবতী। এইজন্য তিনি রাখাল ও গুরুচরণের সঙ্গে, অনেকক্ষণ, অনেক কথা কহিবার সঙ্কল্প করিলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কথাই মনের দ্বার স্বরূপ। কথা দ্বারা মনের ভাব জানিতে পারা যায়। গুরুচরণকে কহিলেন,—

"রাখাল কি বাড়ী থাকে? সে কোথা চাকরী [illegible] না?"

"সেত চাকরী করতে জানে না, বাড়ীই থাকে।

"তবে তাদের চলে কিরূপে? এখন ত তাদের আর কিছু নাই।"

রাখাল দাস ছদ্মবেশে ফেরিওয়ালার ব্যবসায় করিয়া

বেড়াইত, গুরুচরণ তাহা জানে। কিন্তু কাহার নিকট প্রকাশ করিবার কথা ছিল না। এখন আর প্রভুর কাছে তাহা অপ্রকাশ রাখিতে না পারিয়া সব বলিল। রাখাল মুসলমানের ন্যায় দাড়ী গোঁপ পরিয়া এবং হাতকাটা ফতুয়া গায় দিয়া নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়ায়, তাহাও বলিল। দেবেশ বাবু, রাখালের অতিশয় ক্লেশে সংসার চলে, ইহাই জানিতেন ; এখন তাহার এতদূর মন্দ অবস্থা হইয়াছে, শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু রাখাল যে, চুরি চামারি না করিয়া এবং পাচকতা প্রভৃতি নীচ কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া, কৌশলে এরূপ ব্যবসায় করে, ইহাতে তাঁহার একটু সন্তোষও হইল। পুনরপি গুরুচরণকে কহিলেন,—

"এ ব্যবসায়ের টাকা কোথা পাইল ?"

"আজ্ঞে,—আমি—না—না—মাঠাকুরুন দিয়ে থাক্‌বেন। তাঁর হাতে কিছু আছে কিনা।"

"আমি,—কি ?"

"আজ্ঞে, আমি কিছু জানিনে বল্‌ছিলাম।"

"ভাল ! রাখালকে ডাক।"

গুরুচরণ বাহিরে গেল। রাখাল দেবেশ বাবুর সম্মুখস্থ দ্বারে দণ্ডায়মান। দেবেশ রাখালকে অনেক দিন দেখেন নাই, চিনিতে পারিলেন না। রাখালের পরিধানে একখানি জীর্ণ মলিন বস্ত্র। গাত্রে একখানি চাদর। চাদর খানি এত ছোট, কোন বালকের চাদর বলিয়া বোধ হইল। রাখালের সে বাঁকাতি কাটা বাউরি চুল নাই,—সে অষ্টাঙ্গে চুনাট্‌ করা পিরান্ নাই,—সে দাশুরায় পেড়ে শান্তিপুরে ধুতি নাই,—বিনামায় অশ্বক্ষুর-

গম্ভিত সে শব্দ নাই। সুতরাং দেবেশ বাবু রাখালকে চিনিতে পারিলেন না। বসিতে বলিলে, রাখাল, পা-মাটীতে রাখিয়া ফরাসের এক প্রান্তে বসিল। দেবেশ কহিলেন,—

"রাখাল, গুরো তোমার কাছে কত টাকা পাবে?"

রাখাল চমকিয়া উঠিল। কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল, এ টাকার কথা তাহার নিজ পরিবারগণ এবং দুই একজন প্রতিবেশী জানে; দেবেশ বাবু কখনই জানেন না। কারণ দেবেশ বাবু যাহাতে জানিতে না পারেন, গুরুচরণ তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিল এবং তাহাদিগকেও সতর্ক করিয়া ছিল। দেবেশের আকস্মিক প্রশ্নে রাখাল হতবুদ্ধি হইয়া বলিল,—

"এক-শ টাকা।"

"আর কিছু পাবে না?"

"এক বছরের সুদ ২৫ টাকা, কিন্তু সুদ দেবার কথা ছিল না।" দেবেশ রাখালের নিকট যেরূপ উত্তর পাইবার আশা করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাইলেন। সুতরাং ও কথার আন্দোলন ছাড়িয়া কহিলেন,—

"এতরাত্রে কি মনে করে এসেছ?"

"আজ্ঞে, ভীমের দৌরাত্ম্যে আমরা বাড়ী থাকতে পাই না। সে গাঁজা খোর,—ষণ্ডা—আমার মারে বাপান্ত করে।"

"কেন?"

"হরিমতিকে নিয়ে যেতে চায়,—পাঠাতে মার মত হয় না। এইজন্যে মাঝে মাঝে আসে,—আর ঝগড়া করে। তার উপদ্রবে কাল বাড়ীর কারো খাওয়া হয়নি। আমি আজ সাত দিনের পর বিদেশ থেকে রাত্রে বাড়ী এসেই এই কাণ্ড শুনলাম।

আপনার কাছে নালিস কচ্ছি,—আপনি তারে ডেকে শাসন ক'রে দিন।"

"পাঠানতে হানি কি ?"

"কোথা পাঠাব ? তার বাড়ী নাই,—ঘরনাই,—এক মুটো খেতে দেবার সঙ্গতি নাই। আমি খাই ভাঁড়ে,—সে খায় ঘাটে।"

"তবে নিয়ে যেতে জিদ্ করে কেন ? তোমরা কি তারে, যত্ন করনা ?"

"আমার ভগ্নীপতি,—পিতৃতত্তুল্য, কুলীনের ছেলে,—যত্ন করিনে ? মহাশয় বলেন কি ? হয় নাহয় গুরুচরণ দাদাকে জিজ্ঞাসা করুন্।" দেবেশ বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"তাবটে। ভাল! তবে আজ বাড়ী যাও, কাল যাহয় করিব।" বলিয়া রাখালকে বিদায় করিলেন।

রাখালের ভগ্নীর নাম হরিমতি। হরিমতি সুন্দরী ও যুবতী। ভীম, তাঁহার মনের মত স্বামী নহে। গুরুচরণ ও রাখালের কথায় দেবেশ বাবু এই মাত্র বুঝিতে পারিলেন, গুরো, রাখালকে এক-শ টাকা কর্জ্জ দিয়াছে এবং যেদিন পাঠাবে, সেইদিন তাহাকে সুদ শুদ্ধ টাকা গুলি দিতে হইবে। "কি পাঠাবে ? হরিমতিকে ? যেদিন পাঠাবে, সেই দিন গুরুচরণকে টাকা গুলি দিতে হইবে ?" এ কথার অর্থকি ?—এই জন্যই কি হরিমতিকে পাঠাতে মাতা ও ভ্রাতার মত হয় না ? অনেক ক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—

"উঃ! ব্যাটা কি নরাধম!"

একাদশ অধ্যায়।

এরা আবার কারা ?

আজ বিজয়া দশমী। পাঠক, গঙ্গাতীরে রায় হাটের উৎসব দেখ! দুই তিন খানি বৃহৎ বৃহৎ নৌকা একত্র বদ্ধ। তদুপরি দারু নির্ম্মিত মনোহর গৃহ। পূজার দালান, সম্মুখে দরদালান,—পুরোভাগে চাঁদনী। সুধাধবলিত স্তম্ভ, সুচিত্রিত কার্ণেস্,—প্রত্যেক স্তম্ভের শিরোভাগে সুদীর্ঘ লোহিত পতাকা,—প্রদোষ-পবনে বিধূয়মান। থামের গায় ডবল দেওয়ালগিরি, তন্নিম্নে ইউরোপীয় চিত্র বিদ্যার নিদর্শনীভূত আয়না। বারেন্দায় বেল্,—মধ্যে ঝাড়,—দোদুল্যমান। যাবতীয় আলোকাধারে বড় বড় বাতি। দালানে প্রতিমা, চাঁদনীতে উৎকৃষ্ট গালিচাসনে নবপরিচ্ছদধারী বাবুগণ উপবিষ্ট। মধ্যস্থলে এক এক যোড়া খড়ুয়া বাজারের আমদানী, খেমটা আড়খেমটার তালে নাচিতেছে। মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য ও করতালি। বড় বড় আলবোলার নল, পাঁচ সাত "প্যাঁচ মারিয়া" স্থূলাকার বাবুদের

মুখে অগ্রস্পর্শ করাইতেছে। নলের গায়ে চাকচিক্যশালী সোনারূপার ডায়মন্। যেন বোড়াসাপ, বাহিরে চরিয়া ফিরিয়া প্রদোষ কালে পর্ব্বত বিবরে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপ তরণী গৃহের নাম "সাংড়া।"

কোন সাংড়ায় যাত্রাদলের কতকগুলি ছোট ছোট বালক, গোবিন্দ অধিকারীর পাঠশালা বসাইয়াছে। কোন সাংড়ায়, পাঁচালীর দল কতভাবের ছড়া কাটাইতেছে,—কত রসাল রসাল গান গাইতেছে। স্ত্রী দর্শক গণের সম্মানার্থ, সাংড়া সকল, মধ্যে মধ্যে দণ্ডায়মান হইতেছে। পাঠক মহাশয়ের গৃহিনী অবশ্যই বিদ্যাবতী। সুতরাং দাশরথির পাঁচালীর কিছু কিছু এবং বিদ্যাসুন্দরের দুই চারি গত্, তাঁহার কণ্ঠস্থ আছেই—আছে। অতএব এস্থলে সে সকল ছড়া বা গানের উল্লেখ অনাবশ্যক। এইরূপ শত শত উৎসবপূর্ণ ভাসমান গৃহ, গঙ্গাবক্ষে শোভা পাইতেছে। এই সকল সাংড়া দেখিয়া কে বলিবে, ভবরাণী গিরিভবন ত্যাগ করিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতেছেন ? অমরালয়-লাঞ্ছিত পিত্রালয়েই বিরাজমানা।

তীরভূমিতে অগণ্য লোকশ্রেণী ;—ভাগীরথীর যতদূর রায় হাটের মধ্যে অবস্থিত, ততদূর পর্য্যন্ত তীরভূমিতে লোকশ্রেণী। ভাগীরথীর বক্রতার সহিত,—লোকশ্রেণীর মনোহর বক্রতা অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে। বৃহতী জনতা,—দেখিলে বোধ হয়না যে, ঘরদ্বার রক্ষার্থ রায়হাটের মধ্যে এক জনও আছে,—যেন সকলেই বিজয়া দেখিতে ঘাটে আসিয়াছে। পর পারে বড় বড় কিস্তি শ্রেণীবদ্ধ,—নিশান উড়াইয়া নৌকার ছাদে বসিয়া মনের সাধে সারি গাইতেছে। নাবিকগণ, এই আমোদ

দেখিবার জন্য, দশ পোনের দিন হইতে, রায়হাটের ঘাটে ধ্বজি গাড়িয়া মহাজনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম গগনে ভাস্করদেব, গৈরিক বসন পরিয়া ব্রহ্মচারিবেশে সন্ধ্যাকৃত্য সমাধানার্থ, হৈমরজ্জু লম্বমান করিয়া গঙ্গাজল আহরণ করিতেছেন। জনতা অধিকতর নিবিড়,—বাস্তবিকই অধিকতর নিবিড় হইতেছিল। যেহেতু সন্ধ্যার অত্যল্প অন্ধকারকে সহায় করিয়া অনেক ভদ্র মহিলা সেখানে উপস্থিত হইতেছিলেন। সানাই দারেরা পুরবি রাগে বিজয়া ধরিল। ভক্তগণ, ভবানীর চক্ষে রোদনের লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। ঢোল, ঢাক, নহবৎ সকলে মিলিয়া যেন "খেলা ধূলো ভাংলো, মামার বিয়ে হলো।" ইহাই বাজাইতে লাগিল। জনতার ভাব ফিরিল! জনতার সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডলে, একটু মলিন ছায়া দেখা দিল। পূর্ণচন্দ্রের নীচে, শুভ্রবর্ণ একখণ্ড পাতলা মেঘ উঠিলে, ধরাতলব্যাপিনী বিশদ কৌমুদী যেরূপ মলিন হয়, ইহাও সেইরূপ মলিনতা,—অতি অল্প।

একটু পূর্ব্বেই সকল সাংড়ায় আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে রংমসাল,—দীপক প্রভৃতি জ্বলিয়া মধ্যাহ্ন রৌদ্রের উজ্জ্বলতর আলোককেও ব্যঙ্গ করিতে প্রস্তুত। আলোকাবলীর প্রতিবিম্ব সকল গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইয়া ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে অনেক প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া গেল। শাদা মেঘের উপর কালো মেঘ উঠিল। আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন জনতাকে এই বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজনের বিসর্জ্জন স্মরণ করিয়া দিল। সেস্থলে এমনই বা কে ছিলেন, যাঁহাকে বিসর্জ্জন যাতনা ভোগ করিতে

হয় নাই ? ফলে যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক এই জনতার ভাব পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন, তাঁহারাই আজ সুখ দুঃখের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। কমলাকান্ত বলেন, মানুষ আম, কাঁঠাল, আনারসের তুল্য হইলেও, তাহার মন একটি পান্তামাত্র,—ঐ পাতার এক পিঠ সুখ,—এক পিঠ দুঃখ।

বিসর্জ্জন দেখিয়া এক সম্প্রদায় স্ত্রীলোক একটি সুঁড়ি পথ দিয়া গ্রামের মধ্যে যাইতেছিলেন। পশ্চাতে একটি মাত্র পুরুষ। পুরুষটী, গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী পুরুষকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য স্ত্রী লোক গুলি পথের এক পার্শ্বে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পুরুষ, যাই-বার সময়, তন্মধ্যস্থা কোন রমণীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুরুষস্পৃষ্টা কামিনী, পশ্চাদ্বর্ত্তিনী প্রৌঢ়াকে কহিল,—

"মা একটু দাঁড়া,—আমার গা কেমন কচ্ছে" বলিয়া বসিয়া পড়িল। পরের দুঃখ "মনে" করিয়া যাঁহাদের চক্ষু জলে ভাসে, তাঁহাদের কেহবা—"আমার ছেলে অনেক ক্ষণ মাই খায়নি" কেহবা "আমার ঘরের কুলুপটা একতালা" কোন রমণী,—"আমাকে আবার অনেকদূর ও পাড়ায় পেন্নাম কত্তে যেতে হবে" ইত্যাদি আপত্তি দর্শাইয়া একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যা, গাত্রোত্থান করিয়া মাতার সহিত কি পরামর্শ করিলেন এবং উভয়ে গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিয়া, যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই সেই পুরুষ, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বটে ?

বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার পর কোন পুরুষের সঙ্কেতানুসারে যে দুইটি স্ত্রীলোক পথহইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তন্মধ্যস্থা প্রৌঢ়া, পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"তোমায় কয়েক দিন নাদেখে, হরি বলে, 'গুরো দাদা কি রাগ করেছে?' এক দিন যে নিমন্ত্রণ ক'রে তোমায় কিছু খাওয়াব, তাও পারিনে। বড় ভয় করে, পাছে পাড়ার ভালখাগীরে কে কি বলে। কাল যাই আলুতি দেখ্‌তে বাবুদের বাড়ী গিয়েছিলাম, তাই আজ দেখা হলো। তোমারে এখানে দেখ্‌তে না পেয়ে, আমরা চলে যাচ্ছিলাম।" পুরুষটি দেবেশ বাবুর খানসামা গুরুচরণ। প্রৌঢ়া রাখাল দাসের মাতা। কন্যাটি, ভগ্নী হরিমতি। গুরুচরণ কহিল,—

"রাখাল দাদাঠাকুরইত এত গোল বাধালে। বাবুর কাছে স্পষ্ট বলেছিল আমি টাকা ধার দিইছি। কিন্তু আমাকে তিনি টাকার কথা জিজ্ঞাসা করায়, আমি ব'লেছিলাম আদায় হবে না

ব'লে মাঠাকুরুন আমার হাত দিয়ে টাকা দিয়েছেন। বাবু সেকথা বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু আরও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করেন, যেন কিছু টের পাওয়ার মত। আমি গোল মাল ক'রে কাটিয়ে দেই। ফলে সেই অবধিই তোমাদের বাড়ী আসা প্রায় বন্ধ করেছি। আমার বাবু তেমন নয়, কোনরূপে কিছু জান্‌তে পাল্লে তখনি দূর ক'রে দেবে। তাহ'লে এমন চাকরী কোথায় পাব।"

"না বাছা, খুব সাবধান থেকো, অমন মনিব যেন ছাড়তে না হয়। তবে আর দেরি করো না,—বাবুরা এতক্ষণ বাড়ী গেলেন।"

"আমার বাবু ঘাটে আসেননি, কর্ত্তা অনেক বলায় তিন দিনের মধ্যে একবার ঠাকুর বাড়ী গিয়েছিলেন। কয় দিন এক ঘরে একলা রয়েছেন,—কারো সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কন না,—মুখ সর্ব্বদাই ভার ক'রে থাকেন। সব চাকর বাকরকে অষ্টপর হাজির থাক্‌তে হয়। এই জন্যই আমি দশ বার দিন, তোমাদের ওদিকে মোটে আস্‌তে পাইনি।"

"বটে! তাইত বলি গুরুচরণ ত তেমন ছেলে নয়। ভাল! তোমার বাবু কেন এমন হয়েছেন?"

"কি জানি কিছু ত বুঝ্‌তে পারিনে। পূজার আগে খবর এলো নমাসে বাবুর ছেলে হয়েছে। আমোদ নেই,—আহ্লাদ নেই,—"

গুরুচরণের কথা শেষ না হইতেই মা ঠাকুরাণী কহিলেন,—

"হরি তোমায় ডাক্‌চে।"

হরিমতি একটু তফাতে দণ্ডায়মানা ছিল। গুরুচরণ তথায় সরিয়া গেল। হরিমতি কহিল,—

"আমোদ নেই,—আহ্লাদ নেই,—তার পর ?"

"বাবু ছেলে দেখ্‌তে গেলেন,—দুই জন ডাক্তার সঙ্গে গেল,—ফিরে আসা অবধিই আগের চেয়ে মনমরা দেখ্‌ছি।"

"তার পর, কি বল্‌না ?"

"তার পর আর কি ?"

"আরে মলো ড্যাক্‌রা, ছোট বাবুর কেমন ছেলে হয়েছে, তা বল্‌না ?" বলিয়া হরিমতি, গুরুচরণের গাল, মৃদু মধুর ভাবে পেষণ করিয়া দিলেন। গুরুচরণ ছোট বাবুর ছেলের কথা যাহা শুনিয়াছিল, হরিমতির নিকট সব বলিল। কপালিনীর ক্রোধবশে পিত্রালয়ে গমন সম্বন্ধে আর কি নূতন সংবাদ, সম্প্রতি পাইয়াছিল, আস্তে আস্তে হরিমতির নিকট তাহাও বলিল, হরিমতি চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—

"বলিস্ কি ?"

"খবরদার ! কারো সাক্ষাতে বলিস্‌নে। বড় ঘরের কথা।"

"মহাভারত" বলিয়া হরিমতি গুরো দাদার কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন। গুরুচরণ দিদিঠাকুরাণীর ফিস্ ফিস্ শুনিয়া কহিল,—

"হরি, তোমার যেন স্মরণ থাকে, গঙ্গাতীরে এই কথা হইল।" বলিয়া গুরুচরণ মাঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইল।

গুরুচরণের প্রভু, গুরুচরণকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানিতে পারিলে সে তত ক্ষতি বোধ করে না। সে যে রাখাল ঘোষালকে এক শ টাকা কর্জ্জ দিয়াছে, দেবেশ বাবু তাহা জানিতে না পারেন। সামান্য একজন খানসামা এক শ টাকা, একেবারে ধার দিতে পারে, এ সংবাদ মুনিবের কাণে উঠা ভাল নহে। এই

জন্যই গুরুচরণ এত সতর্ক। খানসামাগিরি শুনিতে যাই হউক, গুরুচরণের তাহাই লক্ষ্মী। সে দেবেশ বাবুর প্রধান খানসামা। আট টাকা বেতন পায়। মফঃসলের আমলারা বিদায়কালে একবার গুরুচরণের ঘরে তামাক নাখাইয়া যাইতে পারেন না। তিন চারি জন দাস দাসী তাহার অধীনে কাজ করে; সে প্রায় ফলার করিয়া সারে। সে কাপড় ক্রয় করে না; অথচ সর্ব্বদাই চিকণ ভাঁজের পরিষ্কৃত কাপড় পরে ও গৃহিণীদিগকে পরায়। বাবুদের বাড়ী নিত্যই নূতন নূতন আহারের আয়োজন। গুরু-চরণের হাতে সব কাজ, সুতরাং সে, টাকায় সিকি কমিসন লয়। বাতি ও নারিকেল তৈলে, তাহার বাটীর অন্ধকার দূর করে। অম্বুরি তামাক খাইবার জন্য, প্রতিবাসিগণ সর্ব্বদাই তাহার বাটীতে পদধূলি প্রদান করেন। গুরুচরণের স্ত্রী, তাহার অজ্ঞাতে পানের মস্‌লা, বাদাম, কিস্‌মিস্, মিশ্রির কুঁদো, আতর, গোলাপ বিক্রয় করিয়া নগদ পয়সা সঞ্চয় করে। এতাদৃশ চাকরী যাওয়ার ভয়েই গুরুচরণ দিদিঠাকুরাণীর সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে পারে না। সম্প্রতি সাক্ষাৎ করিতে না পারিবার আরও একটী প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বীভৎস-দারিদ্র।

রাখাল দাসের বাড়ী। রাখাল পুরাতন বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, তাহাতে দুই খানি মাত্র ক্ষুদ্র মৃদ্‌গৃহ ছিল। সম্প্রতি ভগ্নী হরিমতির জন্য আর একখানি ঘর প্রস্তুত করিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন যে,—"ভীম আমাদের বাড়ীতেই বাস করিবে, এই জন্য একখানি পৃথক্ ঘর তৈয়ার করা হইল, সে উহার সব খরচ দিয়াছে।" কিন্তু লোকে বলিত,—"গুরো খানসামা, সব খরচ দিয়াছে।"

বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার পর ঐ ঘরের জানালায় আঘাতের শব্দ হইল। মালিনী একাকিনী, অপর একগৃহে বসিয়া ছিলেন। নিকটে শিশু সন্তান নিদ্রিত। আর আর সন্তান ও অন্যান্য পরিজন কেহই গৃহে ছিল না। সকল ঘর চাবি বন্ধ।

আবার শব্দ হইল। পুনঃ পুনঃ আঘাতের পরে "দাদাঠাকুর বাড়ী আছ?" এই কথা মালিনী শুনিতে পাইলেন। মালিনী এই স্বর শুনিয়াই শশব্যস্তে নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া "বাড়ী কেহ নাই" এইরূপ উত্তর করিলেন। আগন্তুক চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাখাল দাস গৃহে আসিলেন। মালিনী দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াই কহিলেন,—

"গুরোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?"

"না।"

"একটু আগে সে তোমায় ডেকে গেল। আমি তার গলার স্বর শুনেই কপাট বন্ধ ক'রেছিলাম।"

"কেন, তোমার ভয় কি?"

"ওকে বিশ্বাসই বা কি?"

"সে যাই হউক, আমি যে যাই। আমায় ঠেলিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় কমিটি হচ্ছে। আমাকে যে, আজ বাদে কাল মেয়ের সম্বন্ধ দেখ্‌তে হবে।"

"তুমি যখন গুরো খানসামাকে, গুরুর মত আসনে বসিয়ে তামাক সেজে দিয়েছ, তখনি জানি তোমার কপালে আগুন লাগ্‌বে। ঠাকুর জামাই আষাঢ় মাসে ঠাকুর ঝীকে নিয়ে যেতে চাইলেন; তোমরা দুই মায় পোয়ে কিছুতে পাঠালে না। তাঁকে অপমান করে বিদায় দিলে। যদি সে সময় বোন্‌কে পাঠাতে, এতদিন যে এ সব চাপা পোড়্‌তো।"

"আরে, তুমিত ছাইও জান না; গুরো কি আর পাঠাবার যো রেখেছে। বলে, যেদিন পাঠাবে সেই দিন এক-[illegible]টিশ টাকা গুণে দিতে হবে। আমি একেবারে এত টাকা কোথা

পাব। আমার আজ খাবার সঙ্গতি নাই।” মালিনী কিঞ্চিৎ-কাল নীরবে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—

“এতদূর? আমি তা জানিনে। ভাল! যখন জান্‌লে যে, রাত নাই,—দিন নাই,—গুরো সর্ব্বদাই বাড়ী আসে, কেহ না থাকিলে তোমার বোনের সঙ্গে ফিস্ ফিস করে, তখন কেন তাকে না তাড়ালে?”

“আমি কি তাড়াবার কথা মারে বলি নাই? আমি যে সে গুয়োটারে বাপান্ত ক’রে বলেছিলাম, গুরো লোক ভাল নয়, তারে বাড়ী আস্‌তে দিওনা,—দুর্নাম হবে। মা বল্লেন, গুরুচরণ মন্দ লোক নয়, সে আমার পেটের ছেলে। সে যাই অসময়ে এক-শ টাকা ধার দিয়েছিল, তাই তুমি ফেরি ক’রে পরিবার প্রতিপালন কচ্ছো। এর উপর আমি আর কি বলবো? তবু কলে কৌশলে টুকিতে গেলে, সে অমনি টাকার কথা তোলে,—আর আমার সাপের মুখে ইযুমূল পড়ে,—আমি গুরো দাদা ব’লে আদর করবার পথ পাইনে।—” রাখাল দাস হঠাৎ নীরব ও অধোবদন হইলেন।

মালিনী,—“তুমি কি কাঁদিতেছ?” বলিয়া রাখালের বদনমণ্ডলে হস্তামর্শ করিয়া জানিতে পারিলেন, রাখাল সত্য সত্যই রোদন করিতেছেন। মালিনী বাহুযুগল দ্বারা রাখালের গলদেশ বেষ্টন ও স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নীরবে রহিলেন। রাখাল মালিনীর চকে হাত দিয়া দেখিলেন, জল পড়িতেছে। অমনি রোদন ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

“কেঁদোনা, কপালে যা আছে তাই হবে। মার সঙ্গে ভাসান্ দেখ্‌তে যাওনি কেন?”

"আমিত কোন বারই ভাসান্ দেখ্‌তে যাইনে, এবারও যেতে চাইনি,—তবু ঠাকুরুন্ ব'লে গেলেন, তোমার কি ভাসান্ দেখ্‌তে যাওয়া ভাল দেখায় ?—তুমি ঘরে থাক। তাই একাকিনী ঘরে রহিয়াছি।"

ইতিমধ্যে রাখাল দাসের জননী, হরিমতি এবং বালক বালিকাগণ বিজয়া দেখিয়া বাড়ী আসিলেন। রাখাল আত্মীয় স্বজনের সহিত দশমীকৃত্য করণোদ্দেশে বহির্গমন করিলেন। হরিমতি সত্বর মালিনীর নিকট গমন করিয়া কহিল,—

"বউ, বড় মজার কথা! রায়দের রাঙ্গাবউ নাকি দেবেশ বাবুর সঙ্গে ধরা পড়েছে!" মালিনী বিস্মিতা হইয়া কহিলেন,—

"বলিস্ কিল্যা? দেবেশ বাবুর দেবচরিত্র—রাঙ্গাবউ আয়স্ত্রী,—ছেলের মা,—এক বাড়ীর মধ্যে,—বলিস্ কি ঠাকুরঝি তোর যে, অবাক্ করা কথা!"

"তাইতে আরও বলি! দেবচরিত্রে সকলি শোভা পায়। ছোট বউ হাতে নাতে ধ'রে দিয়ে রাগভরে বাপের বাড়ী গেল, মাঠের মাঝে পালকীর উপর বাজ প'ড়ে মূর্চ্ছা গেল, নমাস না পড়্‌তে জন্মা জড় ভরতের জন্ম হলো,—

'এ সকল দেবতার লীলাখেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা!'

আর গুরো দাদা, আমাদের বাড়ী এক আধ বার আসে ব'লে, কত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে! রায় হাটের ক্ষুরে দণ্ডবং।"

"ঠাকুর ঝি, তুই এ সকল কথা কোথা পেলি? আমি বলি লোকের ঝি বউর চরিত্রে দোষ দিয়ে আমোদ করা তোর স্বভাব। এও তাই। সে যা হউক, ছেলেটী কি ভাল হবে না?"

"ভাল,—আর হ'তে হয় না। ডাক্তারে বলেছে, গর্ভাবস্থায় কোন ব্যাঘাত হলে, পেটের ছেলে চিরকাল ঐ রকম হয়ে থাকে।"

"আহা! ছোট বউ কেনই বা রাগ ক'রে গেল। রাগ ক'রে না গেলে হয় ত এমন ছেলে হতো না।"

"রাগ ক'রে গেল কেন? আমার কথায় বুঝি বিশ্বাস হলোনা? সত্য মিথ্যা ক্রমে টের পাবে।"

"আমরা আদার ব্যাপারি, জাহাজের কথায় কাজ নাই। আমি কেবল ছোট বাবুর কষ্ট ভাবছি। আহা! প্রথম ছেলেটী!" হরিমতি কহিলেন,—

"খুব হয়েছে! মর্ম্মান্তিক কষ্টে ভুগ্‌তে হয়।"
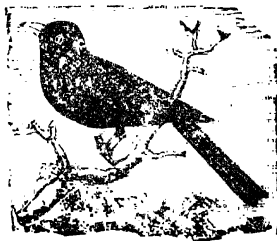
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দেবেশ বাবুর নিষ্ঠুর অদৃষ্ট।

ক্রোধবশে পিত্রালয়ে গমনকালে পথিমধ্যে কপালিনী বজ্র নিনাদে মূর্চ্ছিতা হয়েন। বাহকগণের কেহ হত, কেহবা আহত হইয়া কোথায় ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে। দৈবাৎ তাঁহার জ্যেষ্ঠ তথায় উপস্থিত হওয়ায়, কোন প্রকারে পিত্রালয়ে পৌছিয়াছেন। দেবেশ বাবু এই সব সংবাদ পাইবামাত্র আকাশ হইতে পড়িলেন। কপালিনীর ক্রোধের হেতূৎপাদনে যে পাপ হইয়াছিল, তজ্জন্য শতগুণ অনুতাপ বৃদ্ধি হইল। তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহিণী, প্রান্তরমধ্যে নিরাশ্রয়া রমণীর ন্যায় বিপন্ন হইয়াছেন, এভাবের সঞ্চারে মনে বড় ব্যথা পাইলেন। অপরিণত গর্ভে তাদৃশ শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি নিবন্ধন যে, শেষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে, তদ্বিষয়ে একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল দর্শনে মনকে এরূপ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন যে, কপালিনীর গর্ভে অন্ধ ও জড়

পুত্রের জন্ম হওয়ার সংবাদে যারপরনাই ব্যথিত হয়েন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হয়েন নাই। যাহা হউক, দেবেশ বাবু এতাদৃশ অমঙ্গল ঘটনা হইতেও একটু শুভ ফলের আশা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন, এরূপ অকর্ম্মণ্য ও অসার পুত্র প্রসব করিয়া, কপালিনী একটু মস্তকাহত ও অবনত হইবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা বৃথা হইয়াছিল। কপালিনী যাহা, তাহাই ছিলেন।

দেবেশ বাবু শিশুটিকে আরাম করিবার জন্য ক্রমাগত এক বৎসর কাল বিবিধ চেষ্টা করিলেন। ডাক্তারেরা কহিলেন, এরোগ অচিকিৎস্য। পুত্রের হস্ত পদে কিছুমাত্র অস্থিসংস্থান হয়নাই। তাহা দীপবর্ত্তিকার-ন্যায় শিথিল ও অদৃঢ় রহিয়া গেল। বালকের তাহা সঞ্চালনের কিছু মাত্র সামর্থ ছিলনা। নেত্রের তারকদ্বয় ঊর্দ্ধ পল্লবের মধ্য হইতে বাহির হইতনা। সুতরাং কিছুই দেখিতে পাইতনা। দেবেশ বাবুর বড় আশার প্রথম পুত্রটি এইরূপ অন্ধ ও জড় হইয়াছিল।

একদা সন্ধ্যাকালে শয়নগৃহে বসিয়া আছেন, শিশুটি সম্মুখে শয়ান থাকিয়া হাসিতেছিল। দেবেশ, সেই স্পন্দহীন, শিবনেত্র ও শবাকার শিশুর বদনে অস্বাভাবিক হাস্য বিকাশ দেখিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন গ্রীকেরা যে এই রূপ সন্তানকে গিরিগহ্বরে নিঃক্ষেপ করিত, তাহারা কি ভাল করিতনা? এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার চক্ষু হইতে দুই এক ফোটা জল পড়িলে, আপনাকে একটু শান্ত বোধ করিতেন,—কিন্তু জল পড়িলনা। দেবেশ, বালকের প্রতি অনিমিক্ দৃষ্টি সংযোগ করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। কপালিনী অন্তরে পৃথক্ আসনে আসীনা হইয়া কেবল তাহাই

দেখিতে ছিলেন। কপালিনী এমন ভাবে দেখিতে ছিলেন, যেন দেবেশ বাবুর দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইতেছিল। দেবেশ হঠাৎ কহিয়া উঠিলেন,—

"কপালিনী, আমার মনুষ্য জন্মের সাধ ফুরাইল। দেখ! মানুষ যাবজ্জীবন আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকে,—এবং সন্তানগণকে আপনার অপেক্ষা অধিকতর উন্নত করিয়া যাইবার আশা করে। এই রূপে মানব জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে,—আমার সম্বন্ধে সে পথ রুদ্ধ হইল। অতএব আমার এসংসারে আর কি কর্ত্তব্য আছে?" কপালিনী এসকল কথার অর্থ কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। উত্তর করিলেন,—

"কেন! তোমার ভালবাসার পেটেত খাসাছেলে হয়েছে, তারে নিয়েই সুখী হবে।"

দেবেশ দেখিলেন, কপালিনী রাঙ্গাবউর সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন। আর এক দিন ঐরূপ কথা বলাতেই কপালিনীর সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদেই কপালিনী রাগ করিয়া যান। দেবেশের মনে ইহা স্থির বিশ্বাস যে, কপালিনীর অকারণ ক্রোধ ও স্বেচ্ছাচারিতায় এমন সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এইজন্য কপালিনীর অসাময়িক ও অন্যায় উত্তর শ্রবণ মাত্র ক্রোধে অধীর হইলেন, কিন্তু অন্ধ হইলেন না। ক্ষণমাত্র ঐ গুলি চিন্তা করিয়া নীরবে গৃহত্যাগ করিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

বহির্বাটীতে গমন করিয়াই দেখিলেন, রাখালের ভগিনীপতি ভীম, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভীম, বাবুকে দেখিয়াই কহিল,—

"আপনকার খানসামা গুরুচরণ, রাখাল দাসের নিকট কিছু টাকা পাবে, সে টাকার তাগাদা করে ব'লে, রাখাল আমার পরিবারকে নিয়ে যেতে দেয় না। আপনি এর একটা বিহিত করুন্। না ক'রেন্ ত আমি খুন্ খারাপি, কর্‌ব,—কর্‌বোই—করবো।—না করি ত আমি বিজাতক।" বলিতে বলিতে ভীমের মুখ রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। কপালিনীর আঘাতে দেবেশের মস্তক ঘুরিতে ছিল। সে আবর্ত্তের বিরাম না হইতেই, আবার আঘাত পাইলেন। সকলই বুঝিলেন! টাকা, গুরুচরণ, রাখালদাস, এবং হরিমতি সম্বন্ধীয় যে অন্ধকার, প্রায় দেড় বৎসর হইতে তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, তিনি আজ তাহার মধ্যে আলোক দেখিতে পাইলেন। ভীমকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিলেন। গুরুচরণকে এই অপরাধে একেবারে জবাব দিলে, সে আরও ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যতদিন ভীম, হরিমতিকে গুরুচরণের হস্তবহির্ভূত না করিবে, ততদিন তাহাকে হাতে রাখিতে হইবে। [illegible]বেশ বাবু, মনের তাদৃশ অবস্থাতেও এই গুলি চিন্তা করিলেন। সংশয় হওয়া অবধিই তাহাকে রাখালের বাড়ী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন সে নিষেধের কোন ফল হয় নাই। কিন্তু ঐ নিষেধ বশতঃই গুরুচরণ দিনমান রাখালদের বাড়ী যাওয়া, এককালে বন্ধ করিয়াছিল। বিশেষতঃ ভীম তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এ সংবাদও পাইয়াছিল। সুতরাং তাহাকে কালেভদ্রে, পদে পদে বিপদ শঙ্কা করিয়া, হরিমতির নিকট যাইতে হইত।

ভীম, দেবেশ বাবুর একজন নায়েবের পাচক হইয়াছিল। সেই[illegible] প্রায়ই বিদেশে থাকিত। হরিমতি, ভীম হইতে

তাদৃশ অনিষ্ট শঙ্কা করিত না। দেবেশ বাবুর ভয়েই গুরুচরণ আসিতে পায় না, এইটি তাঁহার মনে লাগিয়াছিল,—এইটীই তাঁহার মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। এই জন্যই মালিনীর সহ কথোপকথনে বলিয়াছিলেন,—

"মর্ম্মান্তিক করিলে, ভোগিতে হয়।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভ্রম!

রায়হাটের রায়বংশীয়দের কেহ কখন পরের চাকরী করেন নাই। তাঁহারা বনিয়াদি জমীদার। সদর মাল গুজারি বাদে প্রায় আশি হাজার টাকা উপস্বত্ব। যদিও কালক্রমে ঐ লাভাংশ কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তথাপি মফঃসলে তাঁহাদের মান সম্ভ্রম ও আদায় উস্থলের বন্দবস্ত পূর্ব্ববৎই ছিল। দেবেশ বাবুর পিতাকেই সকল সরিকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেন। কাল সহকারে দেবেশ বাবুর উপরই, ঐ কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হয়।

দেবেশ বাবু, বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই ভাবিতে লাগিলেন, যদিও আপাততঃ অন্য উপায়ে অর্থাগমের চেষ্টা না করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে জমীদারীর লাভে তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না। এই জন্য তিনি পিতার অনুমতি লইয়া কলিকাতার কোন বিখ্যাত বণিক্ কার্য্যালয়ে একটী প্রধান চাকরী লইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই, চাকরীর অর্থের এক

কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইবে না। অল্প দিনের মধ্যে অনেক অর্থ সঞ্চিত হইবে। ঐ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে কতক অর্থ লইয়া, একটী বিস্তৃত বাণিজ্যালয় স্থাপন করিবেন। কালে তিনি এই অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন।

দেবেশ বাবুর প্রথম চাকরী হইবামাত্র রাঙ্গা বউ বলেন,—

"ঠাকুর পো, তোমার চাকরী হইল, আমায় কি দেবে বল।" দেবেশ উত্তর করিলেন,—

"বউ, চাকরী হইলে সকলেই দিয়া থাকে সত্য! কিন্তু ভাই, আমার সব উল্‌টা। আমার যখন চাকরী যাবে, তখন তোমায় বার ভরির বালা গড়িয়ে দেব।" রাঙ্গা বউ, এই অমঙ্গলের কথা শুনিয়া বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। যাহা হউক, কয়েক বৎসরের পর, তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া, কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং রাঙ্গা বউর নিকট অঙ্গীকার পালনে ত্রুটি করেন নাই। কপালিনী এই সংবাদ পাওয়াবধিই স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী রাঙ্গা বউর প্রণয়াসক্ত। পূর্ব্বে স্বামীর সহিত কথোপকথনে তিনি দুই বার এই আভাস দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সংস্কার, তাঁহার স্বভাবে বদ্ধমূল হইয়া, তাঁহাকে পতিপ্রেমে উদাসীনা ও অবিশ্বাসিনী করিয়াছিল।

কপালিনীর গর্ভাবস্থায় একদা মধ্যাহ্নকালে দেবেশ বাবু শয়ন গৃহের পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন। রাঙ্গা বউর পুত্রটী গণ্ডাকিয়া সারিয়াছে এবং তিনটী চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করিয়াছে, এজন্য তিনি তাহাকে বাঙ্গালা পাঠশালা ছাড়াইয়া, ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিবেন। তাঁহার স্বামী ইংরাজী শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে

অসমর্থ বলিয়া, কপালিনীর বেশাসনে বসিয়া, দেবেশ বাবুর নিকট তাহার দরবার করিতেছিলেন। ক্রমে, কপালিনীর ছেলে, কি মেয়ে হইবে, এই কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক ও আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হইল। কথায় কথায় রাঙাবউ কহিলেন,—

"ছোট বউর প্রথম একটী খোকা হইলে আমার বড় আহ্লাদ হইবে। আমি তাকে মারপেটের বোনের মত ভাল বাসি।"

কপালিনী তখন্ গৃহান্তরে ছিলেন। হঠাৎ উপস্থিত হইয়া রাঙ্গাবউর মুখে তাঁহার শেষ কথাটী শুনিতে পাইলেন। চিরকাল যে সংশয় করিয়া আসিতেছেন, অদ্য "ভালবাসি" এই কথায় তাহার প্রমাণ পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া রাঙ্গাবউকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"পরের সোয়ামী নয় কল্লে, পুতের মাতা খেতে হয়, জাননা বুঝি? চোক্ থাকী,—বুকে বসে দাড়ী ছিঁড়্‌চো?"

রাঙ্গাবউ এ ভাবের কথা কপালিনীর মুখে আরও কয়েক বার শুনিয়াছিলেন। কৌতুক বিবেচনায় হাসিয়া উড়াইতেন। কিন্তু আজ অন্য ভাবে শুনিলেন। কপালিনীর কৌতুক নহে,—সত্য সত্যই বিশ্বাস,—সত্য সত্যই বিদ্বেষ। রাঙ্গাবউ অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রমণীগণ অন্য বিধ কটূক্তি, কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু সতীত্বে অপবাদ এবং "পুত্‌কাটা" বা "চোক্ কাটা", কোন ক্রমেই সহিতে পারেন না। কপালিনী তাঁহাকে এককালে ঐ ত্রিবিধ কটূক্তি করিলেন। রাঙ্গাবউ, এই জন্য দুঃখে ও ক্রোধে হতবাক্ হইয়া, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দেবেশ বাবু কপালিনীর এ ধৃষ্টতা সহিতে পারিলেন না।

পুরস্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গীন প্রভু এমনই বা কে আছেন, যিনি নিজ পত্নীর এমন ধৃষ্টতা সহিতে পারেন? তিনি এই অপরাধে রাঙ্গা বউর সমক্ষে কপালিনীকে যথোচিত তিরস্কার করেন। কপালিনী যাহাকে অসতী ও দাম্পত্যের পরিপন্থিনী স্থির করিয়াছিলেন, তাহার সমক্ষে, অভিমান-তরঙ্গের বেলাস্বরূপ স্বামী কর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়া মনে মরিয়া গেলেন। শত্রু হাসিল, বিষম ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

কপালিনী, দেবেশ বাবু ও রাঙ্গা বউর কথোপকথন, যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গুরুচরণ তাহা সেই ভাবেই শুনিয়াছিল। সে, বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে হরিমতিকে এই সংবাদ প্রদান করে। হরিমতি ইহা অপ্রকাশ রাখিবার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পাঠক! অবগত আছেন যে, তিনি বাড়ী গিয়াই, মালিনীর সমক্ষে ঐ প্রতিজ্ঞা উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

সুধাময়ী।

রাখাল দাসের বিবাহের পর হইতে, পাঠক! খুড়ার কোন সমাচার পান নাই। খুড়া অত্যন্ত ইষ্ট-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বয়সে প্রাচীন হইলেও, প্রাচীনবৎ ব্যবহারে নিতান্ত বিমুখ ছিলেন। যুবাপুরুষের ন্যায় অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কিয়ৎকাল গঙ্গাতীরের বায়ু সেবন করিতেন। পরে শৌচক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃস্নান করিতেন। প্রাতঃকালের শীতল সলিলে অবগাহন করিলে, চর্ম্ম শিথিল হয় না, একটী সাহেব ডাক্তারের মুখে তিনি এই কথা শুনিয়াছিলেন। এই জন্য পৌষ মাসের দারুণ শীতে "ব্রহ্ম হত্যা" হইয়াও, প্রাতঃস্নান বাদ করিতেন না। স্নানান্তে "মাতঃ শৈলসুতা—" এবং "গঙ্গাসলিল পক্কান্নং—" ইত্যাদি স্তবগুলি, সংস্কৃত ভাষার পিণ্ডদান করিয়া আবৃত্তি করিতেন। সেই পিণ্ডদানের ব্যবস্থা, ইদানীং আরও উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল। পূর্ব্বে সেই অশুদ্ধ শব্দগুলি মুখ হইতে নির্গত হইত;

এখন সম্মুখের কয়েকটী দন্তের অভাবে, সে গুলি জড়ীভূত হইয়া অব্যক্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দুষ্ট বালকেরা আবার তাহার অনুকরণ করিয়া, তাঁহাকে বিরক্ত করে। পাছে কেহ মনে করেন যে, কেবল বয়োধর্ম্মেই খুড়ার দন্তপাত হইয়াছিল, এই জন্য তাঁহার স্বপক্ষে লেখককে সাক্ষ্যদান করিতে হইল।

প্রথম সংসারের অন্যথা হওয়ায় খুড়া দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের শাশুড়ী ঠাকুরাণী, জামাতার অধিক বয়সের কথা শুনিয়া কাঁদিয়াছিলেন। খুড়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ভ্রম সংশোধনার্থ তাঁহার সমক্ষে ছোলা চাউল ভাজা খাইতে আরম্ভ করেন। অল্পক্ষণ পরে শাশুড়ী দেখিতে পাইলেন, জামাতার মুখ হইতে শোণিত প্রবাহ নির্গত হইতেছে। পরক্ষণে পরিত্যক্ত চর্ব্বিত চাউল ভাজার মধ্যে কয়েকটী ভগ্নদন্ত পাওয়া গেল। তাঁহার প্রথম পক্ষের একটী পৌত্র, এই দাঁত ভাঙ্গার কথা বলিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে খেপাইত। কথিত আছে, রাখালের বিবাহে খুড়া যে চাতুরী করেন, তজ্জন্য রাখালের সম্বন্ধীও, তাঁহার আর একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। অবশিষ্ট কয়টী কোন রূপে বজায় ছিল।

বিজয়া দশমীর ঠিক ছয় মাস পরে, একদা খুড়া প্রাতঃস্নানের পর, একখণ্ড কলাপাতে অষ্টোত্তর শত দুর্গানাম লিখিয়া সেই সনাম পত্র খণ্ড, তিনবার মস্তকে স্পর্শ করাইয়া উৎসৃষ্ট পুষ্পাদি নিক্ষেপ স্থলে ত্যাগ করিলেন। অনন্তর শুভ্রবর্ণ গুম্ফরাজিতে কলপ দিলেন। খুড়া শাক্ত, তাঁহার একটী আহ্নিকের বাক্স ছিল। সেই বাক্সটী নিকটে লইয়া পূজায় বসিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ঘন চতুষ্কোণ একখানি স্বর্ণ কবচ ছিল। সেই

কবচের উপরিভাগ, পূর্ণেন্দুবৎ রক্তচন্দন চিহ্নে অঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে বিল্বদলের বৃন্তমূল দ্বারা মহাযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া কবচখানি তাম্রতটে স্থাপন করিলেন। যথাবিধি পূজা করিয়া বাক্স উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মহাপাত্র পূর্ণ করিয়া তিনবার সুধা (সুরা) পান করিলেন। মহাশঙ্খের মালা ধারণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ জপ করিলেন। তাঁহার মালা ও চষক, শাস্ত্রোক্ত মহাশঙ্খ নির্ম্মিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না. তবে তাহা যে নরকপাল-নির্ম্মিত, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম, যবননির্জ্জিত ভারতের শব-শরীরে, জীবন্যাস করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এককালে যে ধর্ম্মের বলে, বিলাসী বঙ্গবাসিগণও সিদ্ধ হইবার জন্য শ্মশানবাসী হইয়া দুঃসাহসিক কঠোর সাধনে সমর্থ হইয়াছিল, যে সাধনের বলে কুসুমায়ুধের বিচরণ ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়-শাসন, আত্মবঞ্চনা, মন্ত্রগোপন, কষ্ট সহিষ্ণুতাদির বীজ, গুপ্তভাবে উপ্ত হইতেছিল; সেই তান্ত্রিক ধর্ম্ম, দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ কালসহকারে এক লজ্জা ও ঘৃণাজনক কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। দেবেশ বাবুর জ্যেষ্ঠতাত প্রকৃত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি পাপপূর্ণ কলিযুগের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করিয়া শব সাধনের যাবতীয় আয়োজন করেন। কিন্তু শেষে বিশেষ ব্যাঘাতে সে বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। খুড়া তাঁহারই সহযোগী ছিলেন এবং গুরুচরণ, দেবেশ বাবুর অজ্ঞাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সময়ে সময়ে যে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন, খুড়া ও গুরুচরণ তাহা শ্রবণ করিতেন। খুড়া কিরূপ সাধক হইয়াছিলেন, এবং গুরুচরণ খানসামাই বা

তাদৃশ সঙ্গের কিরূপ ফল পাইয়াছিল, তাহা ক্রমে প্রকাশ হইবে। খুড়া প্রতিদিন আহ্নিকের পর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া থাকেন। অদ্য করিলেন না। অদ্য অমাবস্যা—মহানিশায় তাঁহার বাড়ী কালীপূজা হইবে। প্রতি অমাবস্যায় খুড়া স্বয়ং কালীপূজা করিয়া থাকেন।

খুড়া এই অনুষ্ঠান গুলিকে আপনার ধর্ম্মপরায়ণতার লক্ষণ মনে করেন। কিন্তু তাঁহার একজন প্রতিবাসী ইহার অন্যরূপ অর্থ করে। সে বলে, খুড়া, তরুণী খুড়ীর অনুরোধে পুষ্টিকর ঔষধ পথ্য সেবনে প্রবৃত্ত হন। তজ্জন্য কেবল মাংস ভোজনের উদ্দেশেই অমাবস্যা-পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

খুড়া অদ্য অমাবস্যাপূজার আয়োজন ব্যতিরেকে, অন্য একটি গুরুতর কার্য্যে বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয়, একজন দুষ্ট লোকের শাসন করিবার জন্য, সেই দুষ্টের বিরুদ্ধে একখানি কূট লেখ্য প্রস্তুত করেন। তাহার দুষ্টতাও ভয়ানক। সে খুড়াদের দল ত্যাগ করিয়া অন্য দলে গিয়াছিল। সেই লেখ্যের কয় জন সাক্ষী প্রস্তুত করিবার ভার, খুড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের গোলযোগে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়া গেল এবং পূজার আয়োজনে দিবসের অবশিষ্ট অতীত হইল। ক্রমে তামসী নিশা উপস্থিত। রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে মহানিশা হয় না। সুতরাং খুড়ার পূজা সকালে হইবার যো নাই।

সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার হইতেছে। যত অন্ধকার হইতেছে,—রাখাল দাসের জননী ততই ব্যস্ত হইতেছেন। খুড়ার বাড়ী পূজা দেখিতে যাইবেন। খুড়ার কালী পূজায় তাঁহার বড় ভক্তি। সহস্র কর্ম্ম বাদ রাখিয়াও প্রতি অমাবস্যায় পূজা দেখিতে গিয়া

থাকেন। রাখাল দাসের বালক বালিকা গুলিকে সত্বর আহার করাইয়া শয্যায় লইয়া গেলেন। তাহারা নিদ্রিত হইলেই প্রস্থান করিবেন। রাখালের মধ্যম পুত্রের নাম শশী। শশী, বৈকালে রামায়ণ শুনিয়াছিল,—সে শয্যায় দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য সহকারে রামায়ণ আরম্ভ করিল। মাঠাকুরাণী কর্কশ স্বরে "এই খানে মর" বলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিধু, সে এই ব্যাপার দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া,তাঁহার পৃষ্ঠে সজোরে দুই মুষ্ট্যাঘাত করিল। মাঠাকুরাণী অনুনাসিক ক্রন্দন সহকারে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যার নাম শ্যামা, শ্যামা উঠিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"ঠাকুরমা, তুই আমার কাছে শো,—শুয়ে শ্লোক বল্।" মাঠাকুরাণী দেখিলেন, মহাবিপদ। তাহাদিগের জাগ্রদবস্থায় গমন করা কঠিন,—অথচ না গেলেও নয়। দেখিতে দেখিতে নয়টার গাড়ী গেল। তিনি ক্রমেই অধিক ব্যস্ত হইতে লাগিলেন।

খুড়ার অন্তঃপুরে একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠ আছে। তথায় বাড়ীর প্রায় কেহ যায় না। খুড়া মধ্যে মধ্যে সেখানে অবস্থিতি করেন। বিশেষতঃ অমাবস্যার রাত্রে সেই ঘরে আহার করিয়া থাকেন। অদ্য যথাকালে পূজায় বসিলেন। পূজা সাঙ্গ করিবার উদ্দেশে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। বক্ষঃশোণিতে বিল্ব পত্রে কি লিখিয়া আহুতি দিলেন। পরে ভোজ্য পানীয় নিবেদন করিয়া অন্তঃপুরস্থ পূর্ব্বোক্ত গৃহে গমন করিলেন। রজনী গভীর,—অন্ধকার নিবিড়। শৃগালেরা একবার মিলিতোচ্চস্বরে ডাকিয়া উঠিল। পর ক্ষণে নীরব। সমীরণ রহিয়া রহিয়া লম্বমান তরু শাখায় আঘাত করিতেছে। সে আঘাতে

পুরাতন ঘরের শিথিল বদ্ধ কবাটও নড়িতেছে। খুড়ার গৃহদ্বার শব্দ করিয়া উঠিল—বাতাসে। আবার শব্দ,—বাতাসে? কঠিন শব্দ,—শব্দ যেন সজীব পদার্থের সঞ্চারব্যঞ্জক। খুড়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। একটী স্ত্রীলোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। স্ত্রীলোকটী অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ পূর্ব্বক খুড়ার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রমণীকে দেখিবামাত্র খুড়া বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"সুধাময়ি, সুধাপান করিয়া অমরত্ব লাভ কর।" সুধাময়ী তিন চারি বার সুধাপান করিয়া খুড়ার সহিত মৎস্যমাংসাদি উত্তমরূপে আহার করিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"ঠাকুর পো, তোমার সঙ্গে আমার পোনের বছরের পিরিত। তবু এক দিনও আমার আর সে জন্য গঞ্জনা নেই। কিন্তু হরিমতির জ্বালায় বড় জ্বালাতন হচ্ছি।" সুধাময়ী, রাখাল দাসের জননী। পাঠক! তাঁহার আক্কেল, দেখিতেছেন? খুড়া কহিলেন,—

"হে সোনাকুঁকি রত্নগর্ভা জন,—আঃ ছি!" কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের রচিত অজাস্তোত্রের অন্তর্গত "সোনাকুঁকি রত্নগর্ভা জননী তোমার।" খুড়া এই চরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া সুধাময়ীকে সম্বোধন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ "জননী" পর্য্যন্তই বাহির হইয়া যাইতেছিল। অপ্রতিভ হইয়া সম্বোধনের ব্যাপার ছাড়িয়া পুনরপি কহিলেন,—

"হরিমতি, তোমার সার্থক মেয়ে। সে তোমার বদ্‌নাম ঢেকে দিচ্চে।"

"সত্যি ভাই, তাইতে কি হরিমতিকে নষ্ট হ'তে দিতে

আমার কষ্ট হইনি? নহিলে আমি প্রতিবাদী হ'লে, হরিমতি কি নষ্ট হতে পাত্তো? আমিই হরির মাতা খেইছি। খুব্ করেছি। যে জামাইয়ের দশা! খুব্ করেছি। কিন্তু আমার বউর বড় তেজ,—খরসা মুখী,—কবে তার বিষ দাঁত ভাংবো?"

"এখানে একদিন বউমাকে পূজা দেখাতে আন্‌তে পার না?"

"বুড়ো খোষনা, তুমি মর।"

"কেন? আমি বইকি, আর লোক নেই?"

"লোক থাক্‌লেই হয় না,—টাকা চাই।"

"লোকও আছে,—টাকাও আছে।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে। সে যা হোক্,—আপাতক বড় বিপদ। হরি পোয়াতি,—ভীম আজ সাত আট মাস এখানে নেই।"

"তার আর বিপদ কি? তারে আনাও।"

"অনেক চেষ্টা করেছি,—সে আসে না।"

"শুনেছি হরিকে নিয়ে যাবার জন্য দেবেশ বাবুর কাছে দরবার ক'রে ছিল; এখন আসে না কেন?"

"হরি তখন যেতে চায়নি।"

"বটে! তবে তারকেশ্বর দর্শনে চল,—আমি সঙ্গে যাবো,—কোন চিন্তা নাই।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভুবনেশ্বরী।

কপালিনীর কঠিন বাক্যে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবেশ বাবু অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন। সপ্তাহকাল বহিরুদ্যানে বাস করিলেন। সাত দিনের মধ্যে কপালিনী একবার সন্ধানও করিলেন না। আর কে সন্ধান করিবে? এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জননীর মৃত্যু হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে গৃহিণীর পরলোক হইলে কর্ত্তাদিগের প্রায়ই সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। কেবল মাত্র বৈরাগ্য নহে। রমণী জাতির সংসর্গবিরহে পুরুষেরা স্বাভাবিক কাঠিন্য ও শুষ্কতা প্রাপ্ত হন। সুতরাং দেবেশ বাবুর পিতা গৃহিণী বিরহে বিরক্ত, স্নেহহীন ও ক্রোধন হইয়া উঠিয়া ছিলেন। সাংসারিক কোন বিষয়, আর তাঁহার ভাল লাগিত না। অথচ সকল বিষয়েই লিপ্ত হইয়া কেবল অশান্তি উৎপাদন করিতেন। অতএব এখন কপালিনীব্যতীত তাঁহার তত্ত্ব লই-

বার আর কে আছে? দুই তিন দিন অতীত হইলেই দেবেশ বাবু ভাবিতে লাগিলেন,—"স্ত্রী পরগাছা,—জননী বা ভগ্নী থাকিলে আমি রাগ করিয়া এক দিনও বাগানে থাকিতে পারিতাম না।" দাস দাসী কর্ত্তব্যপরায়ণ,—প্রভুর নিদেশবর্ত্তী; কিন্তু প্রভুর জন্য প্রাণ কাঁদে এমন দাস দাসী কয়টা মিলে? প্রভু আজ্ঞা করিলে, ভৃত্য সবই করিতে পারে। আজ্ঞা করে কে? অতএব এখন যদি দেবেশ বাবু মনের দুঃখে দুই দিন নীরব রহেন, তাঁহার আহারাদি হয় কিনা, সন্দেহ।

"সেই ধানে সেই চাল
গিন্নি বিনা আল্‌থাল্‌।"

একা গৃহিণী অমানুষ বলিয়াই দেবেশ বাবুর রাজার সংসারে সুখ নাই।

ধর্ম্মপত্নীর সহ স্বামীর প্রণয়নির্ণয়, বড় সহজ ব্যাপার নহে। দাম্পত্যপ্রণয়ের একটা ভাণ্ড আছে। সেই ভাণ্ডমধ্যেই দম্পতীর সম্পত্তি সঞ্চিত থাকে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াসক্তি নামক দুইখানি সুবৃহৎ ও গুরু-ভার প্রস্তর, ঐ ভাণ্ড-মুখে স্থাপিত আছে। ঐ প্রস্তর দুইখানি অপসারিত করিতে পারিলে দেখা যাইতে পারে, ভাণ্ডমধ্যে কিছু আছে, কিনা। কোন ভারি পদার্থ স্থানান্তর করিতে হইলে দুই একটি অবলম্ব দণ্ডের প্রয়োজন। এমন স্থলে অনেকে সুপরিপক্ক বংশ কিংবা সুন্দরী কাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ সকলের পরিবর্ত্তে, আমার একটি মাত্র এক পয়সা মূল্যের কীটাকুলিত-পক্ষ লেখনীর সমাবেশ আছে; আমি তদ্দারাই পাতর দুইখান উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিব। তবে পাঠকের কাণে কাণে একটা কথা

বসিয়া রাখি, যদি নিতান্তই না পারি কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াসক্তি-রূপ প্রস্তর ভেদ করিয়া ভাণ্ডমধ্যে "উঁকি মারিবার" ভার আপনার উপর রহিল।

দেবেশ বাবু যদি মার্জ্জার হইতেন, তাহা হইলে কপালিনী কর্ত্তৃক আহত ও বহিস্তাড়িত হইয়াও তৎক্ষণাৎ আবার গৃহ প্রবিষ্ট হইতেন। দেবেশ বাবু মানুষ, অতীতানুশীলনে অপটু—পরোক্ষানভিজ্ঞ—নিকৃষ্ট জীব নহেন। কিন্তু মানুষ যে নিকৃষ্ট জীবেরই পরিণাম, তাহাতেও সংশয় নাই। নহিলে সেই আঘাত সপ্তাহ কালের অধিক তাঁহার স্মৃতিপথে রহিল না কেন? আবার দেবেশ বাবু মানুষ বলিয়াই সুখ দুঃখ, আশা বৈরাগ্য, প্রণয় বিয়োগের অধীন। এ জন্যই সপ্তাহ পরে তাঁহার পতন হইল। ভাবিলেন,—"স্ত্রী পর বটে, কিন্তু পরতুষ্টি সাধনাতেইত সাংসারিক যাবতীয় সুখ নিয়োজিত আছে। আমি সুখ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু সুখত আমাতে নাই, কপালিনী নিতান্ত নবীনা,—তাহার বুদ্ধির সম্যক্ পরিপাক হয় নাই। আমার প্রতি যে সকল কটূক্তি করে, হয়ত, তাহা না বুঝিয়াই করে। আমার মতে যেখানে জ্ঞান নাই,—সেখানে পাপ নাই,—যেখানে পাপ নাই,—সেখানে দণ্ড নাই। অতএব আমি ক্রোধবশে গৃহত্যাগ করায় কপালিনীর যদি কিছু ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা অন্যায় হইয়াছে। তবে আমি কেন আজ বাড়ী যাই না?" দেবেশ বাবু অনেক ক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন।

"মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং
ন লাভো ন ক্ষতির্ম্মম।—"

কপালিনীর ব্যবহার দর্শনে কেহ অনুভব করিতে পারেন না

যে, সাংসারিক কোন ঘটনায় তিনি আপনার লাভ বা ক্ষতি মনে করেন। দেবেশ বাবু তাঁহার কটূক্তিতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, গৃহত্যাগ করিলে, কপালিনীর বাহ্যভাবে কিছুমাত্র বিকার লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্ববৎ যথাসময়ে আপন কর্ত্তব্যাদি সম্পন্ন করেন। পূর্ব্ববৎ আগন্তুক রমণীগণের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করেন। পূর্ব্ববৎ আপনি একাকিনী থাকিয়া আপন গৌরবেই গুন্ গুন্ স্বরে গান করেন, এবং কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা রহেন। এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইল। "অপরিষ্কার দেখিলে তিনি বড় বিরক্ত হন।" একদা দাসীদিগকে এই কথা বলিয়া আপন গৃহ সকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিতে আদেশ দিলেন। কোন সময়ে দাসীরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ কার্য্যে আসিলে—"একি বেশ্যার ঘর পেয়েছিস্, তাই এত কোরে সাজাচ্ছিস্?" বলিয়া তাহাদিগকে সতিরস্কারে বিদায় করিতেন। পূর্ব্বে দেবেশ বাবু স্বয়ং গৃহের অপরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিলে, হয় ত, তাহা কপালিনীর কর্ণেও স্থান পাইত না। ঐ দিন অপরাহ্নে কপালিনী আপন মনে কতই চিন্তা করিলেন। "ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া,—অঙ্গ আভরণহীন করিয়া,—কেশ অসংস্কৃত রাখিয়া, আমি হীন বেশে থাকি বলিয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হন। অথচ আমার যাহা আছে, রায়হাটে কাহারও তাহা নাই। আমার কোন জিনিস্ পছন্দ হয় না মনে করিয়া, তিনি যেখানে যাহা ভাল পাইয়াছেন, আমার জন্য আনিয়াছেন; আমার কত কাপড়,—গহনা, সিন্ধুক বাক্সে পচিতেছে। কিছুই পরিতে সাধ হয় না। আমি কিছুই পরি না,—অথচ আমার সব থাকিবে। থাকিলেই মন সুস্থ। লোকে

যেন না বলিতে পারে, আমার এই কাপড় নাই,—কি এই গহনা নাই। কেহ কেহ বলে, কপালে না থাকিলে কোন জিনিস ভোগ হয় না। সে একটা কথার কথা! ভোগ আমার হাতের কাজ।" বলিয়া তাঁহার ঢাকাই, বাণারসী, বালুচরী, শান্তিপুরে, লেশ্, ক্রেপ্,প্রভৃতি যত উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য বস্ত্র ছিল এবং যেখানে যত আভরণ ছিল, সমুদায় বাহির করিলেন। পুষ্পবাসিত তৈল-সংযোগে স্বহস্তে কেশ সংস্কার করিয়া মণি-বিজড়িত বেণীদ্বারা কবরী বন্ধন করিলেন। তাঁহার সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ, নবেন্দু-বিনিন্দিত অপ্রশস্ত ললাটফলকে সুবিন্যস্ত হইয়া এবং উপমান-নিচয়ের অপমান বিধান করিয়া, মনোহর শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। চিবুক, নাসিকা ও ভ্রূযুগ মধ্যে কস্তূরীবিন্দু ও কস্তূরীতিলক ধারণ করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মনোনীত আভরণগুলি বাছিয়া বাছিয়া যথাস্থানে ধারণ করিলেন। সুলোল-নীলালক-শোভিত গণ্ডে মীনকুণ্ডল আন্দোলিত হইতে লাগিল। বন্ধুজীববিনিন্দী ওষ্ঠাধর ও কুন্দোদ্ভাসিত দশনাবলীর মধ্যে পরস্পর ছবিবিনিময় আরম্ভ হইল। রত্নবলয়, রত্নাঙ্গুরীয় প্রভৃতি করাভরণে করাঙ্গুলিনিচয় অনুপম শোভাধারণ করিল। এক খানি ভাল দেখিয়া বাণারসী পরিলেন। ক্ষীণ কটিদেশ হৈতে, হৈমমেখলার কিয়দংশ, নিতম্বোপরি লম্বিত হইল। মনোহর মুক্তার হার, বাণারসী সংসর্গে লোহিতাভ হইয়া কুচকুট্মলে বিহার করিতে লাগিল। কপালিনীর যৌবনজলধি, লাবণ্য-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মনের সাধে বেশবিন্যাস করিলেন। গাত্রবস্ত্র উন্মোচিত ও সঙ্কুচিত করিয়া উরুদ্বয়ে চাপিয়া ধরিলেন। সুগন্ধিজলবাস হস্তে লইয়া সুদীর্ঘ প্রসাধন

দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন এবং চরণমঞ্জীরের মঞ্জুল ধ্বনি করিয়া, দর্পণবিম্বে আপাদমস্তক আত্মরূপ অবলোকন করিয়া হাসিলেন। সহসা দর্পণে একটি পুরুষমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল, অমনি তাঁহার কৌমুদী সমুজ্জ্বল রাকেন্দুবৎ সেই সস্মিত বদন, জলভারাক্রান্ত জলদের ন্যায় গম্ভীর হইল। এই মেঘে আবার চপলা চমকিল। কপালিনী আবার হাসিলেন। দাঁতে জিব কাটিয়া বদনমণ্ডল অবনত ও বস্ত্রাবৃত করিয়া শশব্যস্তে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মূর্ত্তি দেবেশ বাবুর। ভাবুক পাঠক, অবশ্যই বুঝিয়াছেন প্রসাধনক্রিয়ার পরেই, কি নিমিত্ত কপালিনীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অপরিচিত পুরুষ।

পল্লীগ্রামস্থ প্রত্যেক সুরাবিপণির দুইটি দ্বার। একটি সম্মুখে—তদ্দ্বারা সকলেই যাতায়াত করে। অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, বিপণির একপার্শ্বে বা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এই দ্বারটী নিষিদ্ধ কালেও খোলা থাকে। উহা দ্বারা "ভদ্র" লোকেরা যাতায়াত করেন। ঐ দ্বারে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ ও বামভাগে দুইখানি ক্ষুদ্র তক্তাপোষে, কিংবা বংশমঞ্চে দুইটি মেলের মাদুর পাতা থাকে। বিক্রয়স্থান এবং এই বসিবার স্থানের মধ্যে একটী আবরণ থাকে।

এই গ্রন্থের ষোড়শাধ্যায়ে যে অমাবস্যার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা হইতে ঠিক একাদশ অমাবস্যার দিন মধ্যাহ্নকালে রায় হাটের সুরাবিপণির উক্তবিধ আসনে একটি লোক উপবিষ্ট ছিল। লোকটী তরুণবয়স্ক ও বলিষ্ঠ। কিন্তু বদনমণ্ডল অপ্রসন্ন, ভাবচঞ্চল, লোচনদ্বয় লোহিতাভ ও ক্রোধব্যঞ্জক।

লোকটি যে, একটু সুরাপান না করিয়া ঐ আসনে বসিতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ বোধ হয় না। বিপণিস্বামীকে কহিল,—

"ওহে বাপু, আমি ব্রাহ্মণ, এখানে আমার কুটুম্ব সাক্ষাৎ কেউ নেই। তুমি যদি এই ঘরে আমার রান্নার যোগাড় করে দাও, বড় উপকার হয়। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার দোকানে থাক্‌বো।" দোকানী প্রথমে একটু আপত্তি করিয়া শেষে স্বীকার করিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণ আহারাদি করিয়া ঐ শয্যায় নিদ্রিত হইল।

দিন গেল। দিনের গতিসহ মানুষের সুখদুঃখও গমনশীল। প্রাতঃকালে মনের অবস্থা যেরূপ, মধ্যাহ্নে সেরূপ থাকে না মধ্যাহ্নে যেরূপ,—সায়াহ্নে সেরূপ নহে। কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্রাবলম্বনে মনের ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাই বা কে বলিতে পারে? নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নবিশেষ, মনের উপর অল্প প্রভাব প্রকাশ করে না। স্বপ্নটি মনে থাকে না, কিন্তু কোন দিন নিদ্রোত্থিত হইয়া মন প্রফুল্ল হয়, কোন দিন অসুখী থাকে। প্রখর রৌদ্রতাপে মনের একরূপ ভাব, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে অন্যরূপ। বনের পাখী ডাকিয়া মানুষকে চঞ্চল করে। আবার কোকিলের ডাকে একরূপ, কাকের ডাকে অন্যরূপ। দিবায় একরূপ—রাত্রিকালে আর এক প্রকার। সময়ের প্রতিক্ষণে নূতন ঘটনা,—নূতন পরিবর্ত্তন। মন সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসে। সময় ও অভীষ্টের সম্বন্ধও, মনঃপরিবর্ত্তনের অন্যবিধ কারণ। মাদকসেবীর, তৎসেবনের কাল, যত অগ্রবর্ত্তী হয়, মন ততই প্রফুল্ল হইতে থাকে। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ক্রমে কয়েক-

জন লোক পশ্চাদ্দ্বার দিয়া ঐ দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন। বোধ হয়, তাঁহারা রায়হাটের "ভদ্র" লোক। দোকানী যথাসাধ্য তাঁহাদের আতিথ্য করিল। সে অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্রের মর্য্যাদা রক্ষায়, অথবা দোকানদারিতে, বিলক্ষণ পটু। সন্ধ্যাকালে যে লোকটি প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"মহাশয়ের পদধূলি অনেক দিন এখানে পড়ে নাই,—কারণ কি?" তিনি কহিলেন,—

"বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ ছয় মাস এখানে ছিলাম না। কল্য শেষ রাত্রে বাড়ী এসেছি,—এ পর্য্যন্ত বাড়ীতেই ছিলাম। আবার আজ রাত থাকতেই রওনা হবো। তাই তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে এলাম।"

"দাসের প্রতি এমনই অনুগ্রহ বটে!"

"সে যা হোক্ আজ আমায় একটু আলাদা স্থান দিতে হবে। রায়হাটের কোন ব্যাটার সঙ্গে যেন দেখা না হয়।"

"যে আজ্ঞে!" বলিয়া দোকানী প্রথম আগত ব্যক্তির জন্য একটু পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াদিল। প্রথমাগত ব্যক্তির পরই একটী অপরিচিত ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করিলেন। দোকানী তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; কিন্তু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় তাঁহার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তাঁহাকে পরমসমাদরে বসাইল। ক্রমে দুই একটী করিয়া কয়েক ব্যক্তি দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন।

তাঁহারা ঐ স্থানে বসিয়া যেরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তৎসহ প্রস্তাবিত আখ্যায়িকার সংস্রব থাকায়, পাঠক

মহাশয়কে তাহার কিয়দংশ শুনিতে হইবে। অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন,—

"আমার ইচ্ছা করে; রায়হাটের এক প্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিয়া, অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'তে দেখি!"

প্রথমাগত ব্যক্তি রায়হাটের কাহার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, এই উদ্দেশে আত্মগোপন পুর্ব্বক পৃথক স্থানে বসিয়া সুরাপান করিতেছিলেন। সুরার বিচিত্রা শক্তি! অপরিচিত ব্যক্তির কথা শুনিয়াই এক লম্ফে তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন,—

"আমার ইচ্ছা করে, তোমার দুই গণ্ডে দুইটী চপেটাঘাত প্রদান করি। তুমি বাবা, সোণার লঙ্কা দগ্ধ কত্তে চাও।" অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন,—

"তুমি আমায় ছাপ্ বানর বল্লে,কি বলবো তুমি বাবার বয়সী, নইলে লঙ্কা দগ্ধ করি না করি, কীচকবধটা আগেই সারিতাম। রামায়ণের আগে মহাভারত সেরে দিতাম।"

"কীচক বধ করে অনেক শালা। রাখাল ঘোষাল যে আমায় কীচক বধ কত্তে চেয়েছে। আবার আমার নামে একটা নালিস্ করেছে;—উঃ ব্যাটা কি মামলাবাজ!" অপর এক ব্যক্তি কহিলেন,—

"কি ঘৃণাকর ব্যাপারই ওদের বাড়ী ঘটছে। ওদের খান্সামা প্রকাশ্যরূপে ওর ভগ্নীরে নিয়ে ঘর কচ্ছে। ভদ্র পরিবারের মধ্যে এই কুদৃষ্টান্ত,—এই পাপ,—অলর্কবিষের ন্যায় সমাজ-শরীরে সঞ্চারিত হ'য়ে সুনীতিরূপ শোণিত দূষিত কচ্ছে। রায় হাটের লোকেরা ইহা দেখেও দেখে না। বিশেষ যে ব্যক্তি, অপরের স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করে, তার বাড়া মহাপাপী আর

নেই। আমার বিশ্বাস যে, যতই সাবধানে পাপ করুক, তার শাস্তি হবেই হবে। তবে সে নচ্ছারের শাস্তি হয় না কেন?”

যে লোকটী মধ্যাহ্নকালে দোকানে আসিয়াছিল, সে প্রথমাগত ব্যক্তিকে দেখিয়াই একটু অন্তরালে লুকাইয়াছিল। উপরি উক্ত কথার শেষ না হইতেই হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বেগে দোকান হইতে বহির্গত হইল। বাহিরে গিয়াই দেখিল, নিকটস্থ পথে এক জন পান্থ অতিশয় মন্দবেগে যাইতেছে। সে যেন দোকানস্থ ব্যক্তিগণের কথোপকথনের প্রতি উৎকর্ণ হইয়াই মন্দ মন্দ যাইতেছে। বিপণি হইতে বহির্গত ব্যক্তি, পান্থকে দেখিয়াই অধিকতর বেগে প্রস্থান করিল।

বোধ হয়, বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা, এডিটরের আফিস্, ধর্ম্ম-সমাজ ও পাড়াগেঁয়ে মজলিস, এই চারিটি একত্র মিলিত হইয়াই সুরা বা গুলির দোকান উৎপন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে ঐ দোকানে সকল প্রকার কথাই শুনা যায়। কখন উহাতে প্রচলিত আইন ও রাজনীতি সম্বন্ধে বিলক্ষণ আন্দোলন হয়। কখন বৈরাগ্যের সুরে রামমোহন রায়ের সঙ্গীত হয়। কখন গোপলা উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালা আরম্ভ হয়। কখন বা দাশুরায়, ভারতচন্দ্র, রাম বসু প্রভৃতির কবিত্বের সমালোচন হয়। এতদ্ব্যতীত সামাজিক নিয়ম ও ঘটনাবলি লইয়াও সময়ে সময়ে বিবিধ তর্কবিতর্ক চলিয়া থাকে। যাহা হউক, রায়-হাটের সুরা-বিপণি হইতে আজ আমরা মন্দ কথা শুনিলাম না। দেখা যাক, আরও বা কি শুনা যায়।

দোকানের প্রায় সকলেই এক একটু উদরস্থ করিয়াছিলেন কাহারও চক্ষে লজ্জা নাই,—মুখে কাঁটাখোঁচা নাই। কোন ভাব

মনে আসিবার পূর্ব্বেই মুখে আসিতেছে। এক জন প্রথমাগত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—

"তুমিই জ্ঞাতি ঘরটা ছারে খারে দিলে। তুমি ভিটা বন্ধক রেখে রাখালের বিবাহ দিয়েই সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ ক'ল্লে। হয়ত এসকল পাপের কতক, তোমাকেও সইতে হবে।"

অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন,—

"সূত্রপাত হয়ে আসছে।"

বিপণিমধ্যে ইত্যাকার কথোপকথন চলিতেছে, এদিকে জলদ-গম্ভীর নিনাদে একখানি অশ্বশকট আসিয়া দ্বারদেশে নিস্তব্ধ হইল। বিপণিস্থ সকলে চকিত হইয়া উঠিল। দোকানদার উঁকি মারিয়া দেখিল, দেবেশ বাবুর গাড়ি। ইতিমধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি আপনার অঙ্গ বস্ত্র হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া প্রথমাগত ব্যক্তির হাতে দিলেন। প্রথমাগত ব্যক্তি যে রামশঙ্কর খুড়া, পাঠক তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছেন। খুড়া, দেখিলেন, উহা তাঁহার নামের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা,—হুগলির মাজিষ্টরের কাছারি হইতে বাহির হইয়াছে। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির পদতলে পতিত হইবার উপক্রম করিতেই, প্রহরীরা ধরিয়া তাঁহাকে গাড়িতে তুলিল। শকটবাজী কশাহত হইয়া বায়ুবেগে ছুটিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

হত্যাকারী।

কলিকালের দেবগণকে নরাধম বলিয়া গালি দিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। ধন্য! কলির তীর্থস্থান! ধন্য! কলির দেববিগ্রহ! তোমরা নরজীবনের পবিত্রতাসাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছ, তাহা তোমরাই জান। কিন্তু তোমরা যে বহুতর পাপের আশ্রয় হইয়াছ,—আমি তাহার অনেক প্রমাণ দিতে পারি। কোন স্থানে "কসাই কালীর" রূপ ধরিয়া কেবল মাত্র পশুহননে প্রবৃত্ত আছ। তথাকার জুগুপ্সিত ব্যাপার দর্শনে পামরের হৃদয়ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়। কোথাও "দস্যুকালীর" রূপে নরশোণিতে পৃথিবীকে দূষিত করিতেছ। কোন্ ব্যক্তি কি অভিপ্রায়ে তোমাদিগের শরণ লয়, তোমরা নিশ্চয়ই জানিতে পার। হে তারকেশ্বর, এলোকেশী তাহার পাপিনী জননীর সহিত কি নিমিত্ত তোমার নিকট যাইত, তুমি তাহা অবগত আছ। কিছু কাল পূর্ব্বে হরিমতি, জারজ

গর্ভ লইয়া তাহার পাপিষ্ঠা জননী ও পামর খুড়ার সহিত কি নিমিত্ত তোমার নিকট গিয়াছিল, তুমি তাহাও অবগত আছ। এইরূপে কত স্থানে কত ব্যক্তি যে, দেবদর্শন ও তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে পাপাচার করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভীমের প্রার্থনানুসারে, দেবেশ বাবু ও অন্যান্য কয়েকটী ভদ্রলোকের যত্নে রাখাল দাসের মাতা হরিমতিকে একবার স্বামিগৃহে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুরুচরণ তখন ইহাতে কোন বাধা উপস্থিত করে নাই। কারণ সে জানিতে পারিয়াছিল যে, হরিমতি স্বামিগৃহে থাকিবে না। হরিমতি বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে গুরুচরণের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া ইহাই বলিয়াছিল যে, সাত দিনের মধ্যে সে শ্বশুরবাড়ী হইতে চলিয়া আসিবে। হরিমতি গঙ্গাতীরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। সে শ্বশুরবাড়ী যাইবার দুই দিন পরেই দেবেশ বাবু গুরুচরণকে বিদায় দেন। গুরুচরণ বুঝিল, সে আপনার দোষে মারা পড়িল। অনেক কাঁদাকাটি করিল, কিছুতেই কিছু হইল না। কারণ দেবেশ বাবু অনেক না ভাবিয়া কোন কাজ করেন না এবং যাহা করেন, তজ্জন্য প্রায়ই তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয় না। দেবেশ বাবুর নিকট হইতে বিদায় পাওয়ার পর হইতেই গুরুচরণ এককালে মস্তকের অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়াছিল। তারকেশ্বর হইতে প্রত্যাগত হইয়া হরিমতির কঠিন পীড়া হয়। কি নিমিত্ত তাহার তাদৃশী পীড়া হয়, জনসমাজে তাহাও প্রচারিত হইয়াছিল। চিকিৎসকেরা কহেন, হরিমতি সেই রোগে মারা যাইবে, অথবা চিরকালের জন্য তাহার শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া থাকিবে। হরিমতির

পাপের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, সুতরাং সে মরিল না,—একরূপ সুস্থ হইয়া উঠিল। গুরুচরণ এই পীড়া কালে অষ্ট প্রহর নিকটে থাকিয়া হরিমতির শুশ্রূষা করিত; কিছু মাত্র সঙ্কোচ, কি লজ্জাবোধ করিত না।

পূর্ব্বাধ্যায়ে রায়হাটের সুরাবিপণিতে যেদিনকার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় গুরুচরণ নিজ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া হরিমতির নিকট যাইতেছে। গুরু-চরণ যে পথ দিয়া যাইতেছে, উক্ত বিপণি সেই পথের ধারে অবস্থিত। দোকানের নিকটবর্ত্তী হইয়াই গুরুচরণ শুনিতে পাইল,—"যে ব্যক্তি অপরের স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করে, তার বাড়া মহাপাপী আর নাই!" গুরুচরণ চমকিয়া উঠিল! আবার শুনিল,—"যে যতই সাবধানে পাপ করুক, তার শাস্তি হবেই হবে।" গুরুচরণ উদ্ভ্রান্ত হইল। আবার শুনিল,—"সে নচ্ছারের শাস্তি হয় না কেন?" গুরুচরণ ভাবিতে লাগিল, "এ নচ্ছার কে?" বিপণিস্থ বক্তৃগণ একবার গুরুচরণের নাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু গুরুচরণ তাহা শুনিতে পায় নাই। কেনই পাবে? "ধর্ম্মের কল, বাতাসে নড়ে।"

গুরুচরণ চলিল। মন্দ মন্দ চলিল। শরীর ভারবিশিষ্ট; মন অপ্রফুল্ল। বামপার্শ্ব দিয়া একটী লোক সন্ সন্ করিয়া চলিয়া গেল! পাঠক অবগত আছেন, এ লোকটি উপরি উক্ত দোকান হইতে বাহির হইয়াছে। লোকটি চেনা বলিয়া গুরুচরণের বোধ হইল। অথচ তাহার পূর্ব্বে গুরুচরণ প্রায় দেড় বৎসর সেই লোকটিকে রায়হাটে দেখে নাই। সেই লোকটিকে গুরুচরণ আপনার বাস্তবিক পরিচিত মনে করিয়া

আপনাকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। যাহার মনে কোন বিষয়ে শঙ্কা থাকে, সে পদে পদে তাহার প্রতিকূল ঘটনা উপলব্ধি করে। গুরুচরণ আজ যাহা শুনিল এবং দেখিল, তাহাতে তাহার উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যাহা হউক, আপন মনে কত কি চিন্তা করিতে করিতে সে হরিমতির নিকট উপস্থিত হইল।

অনেক ক্ষণ গুরুচরণকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া হরিমতি কহিল,—

"এসে অবধি মুখ পুড়িয়ে বসে আছ,—আজ তোমার হয়েছে কি ?" গুরুচরণ কহিল,—

"ভাল ! তোমারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ভীম কি আজ এখানে এয়েছে,—তার কোন সন্ধান রাখ ?"

"কই ! কোন সন্ধান ত রাখিনে। সন্ধানের ফলই বা কি, সে গাঁয়ে আসে শুন্‌তে পাই, কিন্তু আমাদের বাড়ী ত আসে না। আমাদের তারকেশ্বরে যাবার আগে একবার এসেছিল, মা বাড়ী আন্‌বার জন্য কত চেষ্টা কল্লে, কিন্তু সে এমুখো হলো না।" গুরুচরণ একটু হাসিয়া কহিল,—

"সে একেবারে নিরাশ্বাস হয়েই আমারে ছেড়ে দিয়েছে। সে ত সুখের কথা বটে, কিন্তু আর ত এখানে থাকা হয় না। রায় বাবুদের বাড়ী চাক্‌রী ক'রে যে সংস্থান হয়েছিল, এতদিন ব'সে খেলাম ; বাকী যা ছিল, তোমার ব্যামোয় খরচ হয়ে গেল, এখন বিদেশে গিয়ে চাকরীর চেষ্টা না দেখলে ত আর চলে না।"

হরিমতি বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল,—"দাদারই কিছু নেই, —দিন চলে না ; কিন্তু আমার গায়েত দশ তোলা আছে,—

তোমার কিসের অচল? পরে যা ভাল হয়, ক'রো। দুঃখে প'ড়ে, দাদা যখন চেয়েছেন, বউ একে একে আপনার গহনা গুলি সব খুলে দিয়েছে; আমার কাছেও কতবার চেয়েছেন, আমি কিন্তু দিই নি,—এখন তোমার দরকার হ'য়ে থাকে, ন্যাও।"

"ভাল! আমি যদি তোমায় ত্যাগ করি, তা হলে কি কর?" হরিমতির চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া দুই তিন ফোটা জল পড়িল। হরিমতি তৎক্ষণাৎ তাহা দুই হস্তে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল,—

"তোমার জন্য আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন,—আমি পাপ করেছি,—ধর্ম্মও আমায় ত্যাগ করেছেন; এখন তুমিও ত্যাগ কর, পরে আমার যা মনে হয়, তাই করবো।"

"কি কর্‌বে?"

"তোমাকে ব'লে কি হবে?"

"আমায় বল্‌তে হবে।" বলিয়া গুরুচরণ হরিমতির হাত ধরিল। হরিমতি কহিল,—

"হয় গলায় দড়ি, নয় গঙ্গায় ঝাঁপ, এই দুইয়ের একটা করবো।"

গুরুচরণ দেখিল, এই ভাব ব্যক্ত করিয়া ভাল করে নাই। বিশেষ এভাব তাহার অন্তরের নহে। আগমনকালীন ঘটনাবলির ক্ষণিক ফল মাত্র। একটু অপ্রতিভ হইয়া এ সকল কথা ছাড়িয়া, আমোদ আহ্লাদের কথা তুলিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথোপকথন হইলে তাহারা উভয়েই নিদ্রিত হইল। চারিদিকের বাতায়ন ও দ্বার রুদ্ধ। দীপ, নির্ব্বাণোন্মুখ।

হরিমতির ঘরখানি মৃণ্ময় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একটি "মাটী

কোটা” আছে। মাচিকোটার ছাদের উপর নানাবিধ গৃহ-সামগ্রী রক্ষা করা হয়। ঐ ছাদে উঠিবার জন্ম একটি সম-চতুষ্কোণ ছিদ্র আছে এবং ঠিক উহার নিম্নে একখানি বংশময়ী অধিরোহণী নিয়তই সংলগ্ন করা থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়া ছাদের উপর হইতে একখানি ইষ্টক পতিত হইয়া ঘটী, থালা প্রভৃতিতে লাগিয়া বিলক্ষণ শব্দ উৎপন্ন করিল। গুরুচরণ ও হরিমতি অনেক রাত্রি জাগিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং সে শব্দে তাহা-দের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। অল্পক্ষণ পরে একটি লোক সেই বংশময়ী অধিরোহণী অবলম্বন করিয়া ছাদের উপর হইতে গৃহতলে অবতীর্ণ হইল। মল্লবেশে বস্ত্রপরিহিত, মস্তকে উষ্ণীষ বদ্ধ, গলে সুশ্বেতযজ্ঞোপবীতগুচ্ছ মালাকারে দোদুল্যমান, কটিবস্ত্রে এক খানি চন্দ্রহাস সম্বদ্ধ। মুষ্টিবদ্ধ সহ অস্ত্রের অত্যল্প ভাগ বহির্গত। স্তিমিত দীপের অনুজ্জ্বল বিম্ব, তাহাতে চিক্‌ মিক্‌ করিতেছে। আগন্তুক, এক লম্ফে গুরুচরণের পার্শ্বে গমন করিয়া সবলে তাহার বক্ষে অস্ত্র প্রহার করিল। গুরুচরণ একবার মাত্র কঠোরতর চীৎকার করিয়া নীরব হইল। শোণিত-তরঙ্গে হরিমতির বিলাস-শয্যা ভাসিয়া গেল।

বিংশ অধ্যায়।

বিষবৃক্ষে—অমৃতফল !

রৌদ্রের পর বৃষ্টি—গ্রীষ্মের পর বায়ুপ্রবাহ,—অন্ধকারের পর আলোক,—বিয়োগের পর সংযোগ,—বড়ই মধুর। এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্তই বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধারাণী মানিনী হইয়াছিলেন। এই মাধুর্য্যের আকর্ষণেই দেবেশবাবু উদ্যান হইতে অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। আজ বড় আনন্দের দিন। কিন্তু সেই আনন্দের ভরা, আশাতরঙ্গে টল টল করিতেছে—হয় ডুবিবে—নয় ভাসিবে। মানুষের আশায় বিশ্বাস নাই। আশা একপথে গমন করে—ঘটনা অন্যপথে যায়। দেবেশ বাবু আশা-শৈলের তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিয়াছেন,—হয় পতিত হইবেন, নয় তত্রত্য সুখস্পর্শ বায়ু সেবন করিবেন। তোমরা যদি পতনভয়ে ভীত হও,—উঠিও না। যদি উঠিতে সাধ হইয়া থাকে, পড়িতে প্রস্তুত থাকিও। উত্থান ও পতনের মধ্যবর্ত্তী, সুখদুঃখ বিরহিত। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ পদার্থে আকর্ষণ নাই। সেখানকার সকলি শান্ত,—সকলি, সুস্থির !

যে ব্যক্তি জানে যে, সুখদুঃখ, একবৃন্তের দুইটী কুসুম,—পৃথক্ভাবে তাহার একটি লইবার উপায় নাই, সংসারের মায়ায় তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারে না। দুই দিকে যাও,—কিন্তু কোন দিকে আকৃষ্ট হইও না। সংসারের কুটিল পথে সাবধানে পদবিক্ষেপ কর।

কপালিনী স্বকৃত সজ্জায় মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,—আপনার রূপে আপনি মোহিত হইয়া হাসিতেছেন,—আর—

"যার নাই পতি ঘরে,
সে কেন সুবেশ করে?"

বালিকাকালের অভ্যস্ত এই পুরাতন শ্লোকটি মনে মনে আবৃত্তি করিতেছেন, এমন সময়ে দেবেশ বাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনের আশা দ্বিগুণ বাড়িল। আহ্লাদে হৃদয়বন্ধন শিথিল হইল। দেবেশ বাবুর গুরুভার অন্তর, ক্ষণিক উত্তেজনানলে গলিত হইয়া লঘু হইল। কপালিনী কি পদার্থ ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন,—

"আমি যখন ঘরে থাকিতাম,এমন বেশ কখন দেখি নাই।"

"কখন দেখ নাই? তবে ভাল করিয়া দেখ!" বলিয়া কপালিনী দুই হাতে সেই কবরী ছিন্নভিন্ন করিলেন। আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিলেন। মলিন বস্ত্র পরিয়া পরিহিত বাণারসী পদতলে দলিত করিলেন। ওড়না, আঙ্গিয়া প্রভৃতি সমস্তই ত্যাগ করিলেন। সলিল-সংযোগে চরণালক্তক পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া ফেলিলেন। দেবেশ বাবু চিত্রার্পিত প্রায় এই ব্যাপার অবলোকন করিলেন। কি বলিবেন? কপালিনীকে কিছু বলিবার নাই। যিনি কখন আশানুরূপ ফলে

বঞ্চিত হইয়াছেন, তিনিই, আজ দেবেশ বাবুর আশাভঙ্গের দুঃখ বুঝিবেন। সে দুঃখ বর্ণনার সামর্থ, "ছিন্নমস্তা"- রচয়িতার লেখনীতে নাই। কপালিনীর সহবাস সুখের প্রত্যাশা না করিলে, দেবেশ বাবুকে এদুঃখ পাইতে হইতনা। যেখানে সুখের আশা, সেইখানেই দুঃখের সঞ্চার। সাম্যাবস্থ ভূপতিত পদার্থের পতনোত্থান কিছুই নাই। এই জন্যই জ্ঞানিগণ, নিবৃত্তির সমধিক ফলব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা দমগুণ সাধনে এত যত্ন করিয়া থাকেন।

কপালিনী মনে করিলেন, দেবেশ বাবু তাঁহাকে ব্যভিচারিণী বলিলেন। দেবেশ বাবু কখন পরস্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া বিদ্রূপ করিবার সঙ্কল্পও করেননা। যাহাহউক কপালিনী দেবেশ বাবুর কথার উত্তর দিতে কিংবা তাহা হাসিয়া উড়াইতে পারিতেন। তাঁহার হৃদয় নিরপেক্ষ ও স্বেচ্ছাচারী না হইলে, হয়ত, তিনি সেইরূপই করিতেন। কিন্তু তাঁহার মন, গয়ার ফল্গুনদী, —অন্তঃসলিলবাহিনী,—জল প্রায় উপরে থাকেনা,—নিরন্তরই তাহাতে শুষ্ক বালুকা উড্ডীয়মান। দেবেশ বাবু কখন কখন ঐ নদীতে জল দেখিতে পাইতেন। তিনি ভাবিতেন, কপালিনীর হৃদয়, স্বামীর প্রতি ভক্তি ও প্রীতি শূন্য নহে; কিন্তু স্বামীর নিকট খাট হইবার ও মানের লাঘব হইবার শঙ্কায় তাহা প্রকাশ করেননা। দেবেশ বাবুর এ চিন্তা অমূলক নহে বটে, কিন্তু এই চিন্তাবশতঃই তাঁহার এত দুর্দ্দশা! এক দিনের সুখ অনন্ত কাল মনে থাকে, কিন্তু অনন্ত কালের দুঃখ আমরা এক দিনে ভুলিয়া যাই। এইটি বিশ্বরাজ্য শাসন বিষয়ে ঐশ্বরিক গবর্ণমেণ্টের প্রধান রাজনীতি। এই সকল ভাব দেবেশ বাবুর মনে প্রতিভাত

হইল। তিনি এক খণ্ড কাগজে কি লিখিয়া তাহা একটি লোহ বাক্‌সে স্থাপন করিলেন এবং সেই বাক্‌স, তাঁহার বিনা অনুমতিতে কেহ খুলিতে না পারে, এ রূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। কপালিনী হইতে দূরে থাকিবেন, সেই দিন তাহারও সংকল্প করিলেন।

ধর্ম্মপত্নী সংসারি-গণের সর্ব্ব প্রকার আরাম স্থান এবং অপূর্ব্ব পার্থিব সুখের নিদান। দেবেশ বাবু কোন কালই স্ত্রী হইতে সম্পূর্ণ সুখী হননা, বরং যখন তখন অসুখী হইয়া থাকেন। তথাপি কথন কিঞ্চিৎ সুখ লাভ করিয়া,—কথন বা সুখের আশা করিয়া, যে কোন প্রকারে দিন যাপন করিতে ছিলেন। কিন্তু প্রাগুক্ত ঘটনার দিন, ঐ আশারও মূলোচ্ছেদ করায়, তদবধি একরূপ নূতনবিধ অসুখের অগ্নিকণা, তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। তুষানল দাহবৎ সে দুঃখ, দুর্ব্বিষহ। বর্ণিত-পূর্ব্ব সন্তানটি তাঁহার অর্দ্ধজীবন নষ্ট করে,—অবশিষ্ট কপালিনীর হাতে ছিল,—তাহারও বিসর্জ্জন উপস্থিত। দুঃখী দার্শনিক, অদৃষ্টবাদের স্রষ্টা। স্বকৃত কোন দোষে দুঃখ পাইতেছি, এ অনুসন্ধান অপেক্ষা,—দুঃখভোগ অদৃষ্টের ফল,—এ চিন্তায় কতক শান্তি আছে। দেবেশবাবু তরুণবয়স্ক, বোধহয়, তাঁহার সে শান্তিও ছিলনা। কেননা, তিনি অদৃষ্টবাদবিরোধী।

সকলই বিরস। সংসার শূন্য প্রান্তর,—বা গভীর অরণ্য। লোকালয় বিষবৎ। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ক্লেশকর। শরীর ভার বিশিষ্ট,—জীবন অসার। দেবেশ বাবুর এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। যেখানে কেহ কোন কথা কয়না,—কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনা,—কাহার নিকট বিষণ্ণভাবের কারণ

বলিতে হয়না,—এরূপ নির্জ্জন ও নীরব স্থান সকলই তাঁহার ভাল লাগিতে লাগিল। কিছু দিন চিন্তাযুক্ত মনে ঐ রূপ স্থান সকলেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদা হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—"তবে কি স্ত্রী-প্রেমের আস্পদ ও সন্ততি স্নেহে মোহিত হওয়া ব্যতিরেকে এ জগতে আর সুখ নাই? যদি একথা সত্য হয়, তবে মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনা মাত্র। দুর্লভ মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনা নহে। ইহার উদ্দেশ্য আছে,—ইহাতে সুখ আছে,—শান্তি আছে। আমি স্ত্রীপুত্রসম্বন্ধে অসুখী হইলাম বলিয়াই কি আমার সুখের প্রস্রবণ রুদ্ধ হইবে? কখনই না। সমস্ত মানব জাতি আমার ভালবাসার পাত্র। আত্মবৎ তাহাদিগের কার্য্যসাধনে তৎপর হইতে পারিলে আমার সুখের পথ সুপ্রশস্ত হইবে। আমি মানব জাতিকে ভালবাসিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে রায়হাটবাসিগণকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিব। ইহাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ রায়হাটই আমার সূতিকা,—রায়হাটই আমার সমাধি। শরীর, মন, বাক্য ও অর্থ এই উপায়চতুষ্টয় দ্বারা সাধ্যানুসারে রায়হাটের কার্য্য করিব। এই কার্য্যের আসক্তি ও ব্যস্ততায় আমার দিন সুখে কাটিবে।"

রায়হাটস্থ পুলিসকর্ম্মচারিগণের অযোগ্যতা, অর্থলোভ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাবে তত্রত্য অনেক অত্যাচারের প্রতিকার হইত না। দোষী ব্যক্তিগণ বার বার অপরাধ করিয়াও শাস্তি না পাওয়ায় অত্যন্ত ভয়ানক ও দেশের বিশেষ অনিষ্টকর হইয়াছিল। এই সকল দোষের নিবারণার্থ দেবেশ বাবু অবৈতনিকভাবে গুপ্তানুসন্ধায়ী পুলিসের একটী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুগলি জিলায় অত্যাচারিগণের প্রাদুর্ভাব ও পুলিসের নি-

দর্শনে কমিসনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে পুলিস্ কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। দেবেশ বাবু তাঁহাদের অনুরোধে উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি এই কার্য্যে ব্যাসক্ত থাকিয়া অনেক দিন আপনার অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

রায়হাটের কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গাতীরস্থ কোন পল্লীগ্রামে তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট উদ্যানবাটী ছিল। তথায় অবলম্বিত কার্য্যানুরূপ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গুপ্তভাবে বাস করিতেন। তাঁহার অনুমতি না লইয়া কেহই উদ্যানে প্রবেশ করিতে পাইত না। বাটীর কর্ম্মাধ্যক্ষকে পত্রাদির দ্বারা উপদেশ দিয়া বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি এমন গোপনে ও সুকৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন যে, রায়হাটবাসী, কি তন্নিকটস্থ কেহই, তাঁহার চেষ্টা অবগত হইতে পারিত না। এমন কি তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী জানিতে পারে নাই যে, তিনি কি করেন! তাঁহার এক অনুচর,অন্য অনুচরকে চিনিত না ও পরস্পরের গতিপ্রবৃত্তি জানিতে পারিত না। কোন ব্যক্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার উদ্যানবাসের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, কেবল এই মাত্র জানিতে পারিত যে, তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া গুপ্ত-বাস অবলম্বন করিয়াছেন। এই গুপ্তবাস নিবন্ধন কত লোকে কতরূপ সিদ্ধান্ত করিত। কেহ প্রচার করিত, দেবেশ বাবু এক জন চাকরকে খুন্ করিয়া লুকাইয়া আছেন। কোন বুদ্ধিমান্, এ সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়া কহিতেন, দেবেশ বাবু ভ্রাতৃজায়া-প্রেমমন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। কোন ব্যক্তি, এ উভয়বিধ মতেরই খণ্ডন করিয়া কহিতেন,

দেবেশ বাবুর একটি শক্ত পীড়া হইয়াছে, গোপনে তাহার চিকিৎসা করাইতেছেন। দুইটি অত্যুচ্চ ও বলবান্ অশ্ব, দুইটি কালো ঘুড়ি, এবং দুইখানি শকট নিয়তই তাঁহার কার্য্যার্থ প্রস্তুত থাকিত। কয়েক জন প্রণিধি, সর্ব্বদা ছদ্মবেশে তাঁহার আজ্ঞা-পালন করিত। তাঁহার নিজের অসংখ্য গুপ্তপরিচ্ছদ ও ছদ্ম বেশ ছিল। তিনি প্রয়োজন মত সে সকল ব্যবহার করিতেন। এ ছাড়া তিনি এমন স্বর-বিকৃতি অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কোন পরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে বসিয়াও বিকৃতস্বরে কথা কহিলে, "তিনি" কথা কহিতেছেন বলিয়া কোন ক্রমেই বুঝা যাইত না।

খুড়া, হরিমতির গর্ভপাতে সহায়তা করেন, রাখাল দাসের ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত দেখিয়া অর্থের প্রলোভনে মালিনীকে ব্যভিচারিণী করিবার চেষ্টা করেন এবং একখানি কূটলেখ্য প্রস্তুতকরণে সহকারী হন। কোন প্রধান লোকের পরামর্শ ও সহায়তায় রাখাল এই সকল বৃত্তান্ত,বিচারালয়ের গোচর করেন। খুড়ার দোষ সপ্রমাণ হওয়ায় একেবারে তাঁহার নামে "গ্রেপ্তারি পরওয়ানা" বাহির হয়। খুড়া, এই সংবাদ শুনিয়াই "ফেরার" হন। দেবেশ বাবুর প্রতি তাঁহার অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হয়। এই জন্যই রায়হাটস্থ সুরাবিপণির সম্মুখে তাঁহার গাড়ী দৃষ্ট হইয়াছিল। ছদ্মবেশ ধারণকরিয়া বিকৃতস্বরে কথা কহিলে তাঁহাকে, দেবেশবাবু বলিয়া চিনিতে পারা, অসম্ভব। মদের দোকানে খুড়ার সহিত একাসনে বসিয়া যে অপরিচিত পুরুষ প্রথমাবধি কথোপকথন করিতে ছিলেন এবং যিনি খুড়ার হস্তে "পরওয়ানা" অর্পণ করেন, তিনি স্বয়ং দেবেশ বাবু।

একবিংশ অধ্যায়।

"পদ্মের মৃণালে কাঁটা।"

রাখাল দাসের পত্নী মালিনী অতিশয় সুচরিত্রা। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যও অল্প ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার দৈহিক গঠনের আশ্চর্য্য বৈচিত্র! তিনি শীঘ্র শীঘ্র অনেকগুলি সন্তানের জননী হইলেও তাঁহাকে দেখিলে নব যুবতী বলিয়া বোধ হইত। যে, না জানিত, সে তাঁহাকে সন্তানের জননী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। কিন্তু শরীরের প্রতি যত্নের তারতম্যে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই কা[illegible] মালিনী কিঞ্চিৎ মলিনা হইয়াছিলেন। মনের অসুখেও [illegible]র নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার অসুখের কারণ একটি নহে,—অনেক গুলি।

নিজে রূপবতী, গুণবতী—বেশ লেখাপড়া জানেন। সচরাচর এদেশীয় স্ত্রীগণ যে পরিমাণে লেখা পড়া শিখিয়া থাকেন, মালিনী তদপেক্ষা কিছু বেশী জানিতেন। সূচি ও অন্যবিধ শিল্পকার্য্য, গৃহসজ্জাকরণ, শিশুপালন, উৎকৃষ্ট পাকক্রিয়া

ইত্যাদি পুরনারীগণের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি পিতার এক মাত্র কন্যা। এই জন্য পিতা তাঁহাকে পরম যত্নে শিক্ষাদান করেন। পিতা যে, কর্ত্তব্যবোধে এরূপ করিয়াছিলেন, বোধ হয় না। কেননা, তিনি শুক্র বিক্রেতা। শিল্পকরেরা যে উদ্দেশে উৎকৃষ্ট সামগ্রী প্রস্তুত করে, তাঁহার উদ্দেশ্যও সেইরূপ। বিসদৃশসংযোগনিবন্ধন বিধাতা চিরকলঙ্কী। যে বিধি, উপবেশ-শাখাচ্ছেদী গণ্ডমূর্খ ব্রাহ্মণ-তনয়ের হাতে গুণবতী পদ্মাবতী সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বিধিই রাখাল দাসের সহিত মালিনীর বিবাহ নির্ব্বাহ করেন। মালিনীর মনোদুঃখের এই একটি কারণ। অদৃষ্টাধীন বিষয়ে বাক্যব্যয় বৃথা জানিয়া, এই দুঃখ তিনি নীরবে সহ্য করিতেন।

দারিদ্র্যনিবন্ধন রাখাল দাসের গৃহে যে সকল জুগুপ্সিত ও শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের পারিবারিক যে সকল অসুখ ঘটনা হয়, সে নিমিত্ত মালিনীকে সময়ে সময়ে অতীব কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বামী বা শ্বশ্রূসহ প্রায়ই কখন কোন কারণে বিবাদ করিতেন না। মাটীর মানুষ হইয়া সকলই সহ্য করিতেন। সে জন্য সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে সময়ে সময়ে তাঁহাকে গুরুজনের সহিত কলহ করিতে হইত। তথাপি কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিত না; কারণ তিনি অপরাধিনী হইবার জন্য কলহ করিতেন না। হরিমতির জন্য রাখাল দাস সমাজচ্যুত হন। মালিনী রাখালকে বলেন,—"যদি এপাপ ঘর থেকে বিদায় ক'ল্লে আমরা দশের সঙ্গে মিলে মিশে থাকৃতে পাই, তবে না হয়, ভিক্ষা করে খাবো।—আর গাছতলায়

থাক্‌বো, তবু মাতাহেঁট ক'রে বেশ্যার সঙ্গে একত্র থাক্‌বো না।" এইরূপ কথাই তাঁহাদের সঙ্গে বিবাদের হেতু এবং ইহাই তাঁহার অন্যতম দুঃখের কারণ।

প্রাণ বা প্রাণতুল্য পুত্রাপেক্ষা সতীর [illegible] অধিক প্রিয়। "সতীদাহ" ইহার আংশিক প্রমাণ। সুধাময়ী, মালিনীর সেই সতীত্ব আহত করিতেও চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই। সতীর দেবতা পরমাশক্তি ভগবতী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, সুধাময়ী একদা খুড়ার সহিত সুধা পান করিয়া মালিনীর "বিষদাঁত" ভাঙ্গিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ ইচ্ছা এইরূপে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। একদা অপ্রতুল প্রযুক্ত মালিনী সন্ততিগণকে যৎসা[illegible] কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া স্বয়ং উপবাসিনী হইয়া একান্তে উপ[illegible]ষ্টা আছেন। রাখাল দাস সেদিনকার মত কয়েকটি পয়সা, কিংবা কিঞ্চিৎ চাউল, ধার করিবার জন্য পাড়ায় বাহির হইয়াছেন। জনৈক বৃদ্ধা স্ত্রী একখানি ঢাকাই সাটি ও দশটি টাকা মালিনীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিল,—"রাখাল দাসের খুড়া তোমার নিকট এই তত্ত্ব পাঠিয়েছেন, আর আজ রাত্রে কালীপূজায় তাঁর বাড়ী যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছেন।" সুধাময়ী স[illegible] গৃহান্তর হইতে আসিয়া কহিলেন,—"তোল বাছা, যত্ন ক'[illegible] কাপড় ও টাকা ঘরে তোল। আর ঠাকুর পোর বাড়ী রাতে ঠাকুর দেখ্‌তে যাবে, ব'লে পাঠাও। এই দুঃখের সময় এমন তত্ত্ব কে করে?" বোধ হয়, তত্ত্ববাহিকা বৃদ্ধা মালিনীকে আরও কিছু বলিয়া থাকিবে। মালিনী বাম চরণ বিক্ষেপে বস্ত্র ও মুদ্রা প্রাঙ্গণতলে নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন,—শ্বশুর নাগরকে ব'লো,

যেরূপে তাঁর তত্ত্ব গ্রহণ কল্লেম, তাঁর নিমন্ত্রণও সেইরূপে রক্ষা ক'রবো।" এই ঘটনাটী মালিনীর মনোদুঃখের তৃতীয় কারণ।

সুধাময়ী স্বয়ং প্রণয়পাত্রের জন্য মালিনীকে ব্যভিচারিণী করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহা হঠাৎ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সুধাময়ী জানিতেন, তত্ত্ব ঠাকুরপোর মারফতে আসিয়াছে মাত্র; তাঁহার নিজদত্ত নহে। সুধাময়ীর এরূপ বিশ্বাস, কেবল খুড়ার চক্রের ফল। খুড়া মালিনীকে আত্মসাৎ করিবার জন্য নিজেই টাকা ও কাপড় দিয়াছিলেন, কিন্তু সুধা ময়ীকে তাহা বুঝিতে দেন নাই।

কাল, দুঃখানলের ভস্মসদৃশ। এই ভস্মাচ্ছাদনে, দুঃখের প্রতাপ হ্রস্ব হয়। কিয়ৎকাল অতীত হইলে, মালিনীর এই সকল দুঃখের কিছু হ্রাস হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য একাকী আসে না। যে রাত্রিতে রাখালের বাড়ী গুরুচরণ অস্থাহত হয়, তাহার ঠিক সপ্তাহ পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর সাংঘাতিক পীড়া হইল। অর্থাভাবে চিকিৎসা ও ঔষধপথ্যাদির সংঘটন হইতেছে না। মালিনীর আভরণের মধ্যে আয়তী-চিহ্নস্বরূপ কেবল কড় ও লোহার লোহা ছিল। মালিনী বিবাহ কালে অনেক আভরণ পাইয়াছিলেন। অন্নকষ্টবশতঃ এক এক খানি করিয়া রাখাল তাহার সমুদায়ই ঘুচাইয়াছিলেন। কিন্তু মালিনী তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। যাহা হউক, পুত্রের পীড়ায় বিষম বিপদ উপস্থিত। এমন আত্মীয় কেহ নাই যে, সে সময়ে দশ টাকা দিয়া সাহায্য করে। মালিনী কেবল সেই অনাথের নাথ বিপদবন্ধুকে একান্ত মনে ডাকিতে লাগিলেন। রাখাল দাস মনে মনে খুড়া ও জননীকে বাপান্ত করিতেছিলেন। কারণ

তখন তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, খুড়া ও জননীই বিবাহ দিয়া তাঁহার মাথা খাইয়াছেন।

রাখাল দাস নিজে লেখা পড়া জানেন না। বিদেশে তাঁহার বন্ধুবান্ধবও অধিক ছিল না; সুতরাং বিদেশ হইতে ডাকযোগে তাঁহার বাড়ী পত্রাদি প্রায় আসে না। রাখালের পুত্রের পীড়া কালে ডাকযোগে একখানি পত্র আসিল। পত্রখানির শিরো-ভাগে মালিনীর নাম লিখিত ছিল। মালিনী কখন কখন তাঁহার পিত্রালয়স্থা সখীর হস্তলিপি পাইতেন। এ লিপি সে হাতের নহে। অত্যন্ত শঙ্কিত ভাবে পত্রাবরণ ছিন্ন করিলেন। তন্মধ্যে শতমুদ্রার ব্যাঙ্কনোট্! নোট দেখিয়া বিস্মিত ও অধিকতর ভীত হইলেন। তৎসহ একখানি পত্রও ছিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া মালিনীর শঙ্কা দুর হইল। পত্রখানির বিষয় পাঠক পরে অবগত হইবেন।
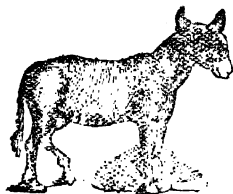
দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নিশীথে—কপালিনী।

কপালিনী শিব গড়াইতে বানর গড়াইলেন। তিনি কি ভাবিতেন, কি ভাবিয়া কোন্ কায করিতেন, তাঁহার ইষ্ট দেবতাও তাহা জানিতে পারিতেন না। যে যতই কেন গম্ভীর, লজ্জাশীল বা উদাসীন হউক না, সময়ে সময়ে মনের কথা বলিবার, তাহারও একজন লোক থাকে। কপালিনীর সেরূপ লোক ছিল না। পরের কাছে মনের কথা বলিয়া সুখী হওয়া, কিংবা দুঃখের ন্যূনতা সম্পাদন করা স্বাভাবিক ঘটনা, কপালিনী তাহা জানিতেন না। সুতরাং "ছিন্ন-বেশা' হওয়ার পর হইতে স্বামীর সহিত চিরবিরহের সূত্রপাত দেখিয়া একটি নূতনবিধ অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। মালিনী যে দিন নোট সহ পত্র পান, কপালিনী সেই দিন নিজ গৃহের একান্তে উপবেশন পূর্ব্বক ভাবিতেছেন—"কি জন্য কি কর্‌লাম কারেই বা বলি, কেই বা শোনে। কুলকামিনীর কপালে আগুন। কুলকলঙ্কিনী হয় ত সুখী। দিবাকরকিরণে দগ্ধ হলে, কমলিনী

মধুকরের নিকট মনের কথা বল্‌তে পারে; মধুকর তা না শোনে,—সমীরণ অবশ্যই শুন্‌বে। আচ্ছা! আমি কি কখন দিবাকরকিরণে দগ্ধ হইছি?” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হইল। কপালিনী বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া অন্ধকারেই অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শারদপৌর্ণমাসীর বিশদকৌমুদী-স্রোতে প্রকৃতি ভাসিতেছে,—হাসিতেছে,—গলিয়া যাইতেছে। দেবেশ বাবুর অন্তঃপুরোদ্যানে ঐ স্রোতের প্লাবন উপস্থিত। ঐ উদ্যান অতি রমণীয়। মধ্যস্থলে সরোবর—নির্ম্মল সলিলে পরিপূর্ণ। তাহার চারিদিকে শস্পময় ক্রমনিম্ন ধরাতল। পুষ্করিণীর ধারে ধারে চম্পক, শেফালিকা ও কামিনী প্রভৃতি কুসুমের তরু সকল শ্রেণীবদ্ধ। এই তরুশ্রেণীর পর একটী চতুর্বেষ্টন পথ। পথের পর চতু-র্দিকে এক প্রণালীতে যাতি, যূথি, নবমল্লিকা, গোলাব, রজনী-গন্ধা, ভূমিচম্পক, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমতরু সকল অবস্থিত। তাহার পর আবার প্রশস্ত পথ। এই পথের দুই পার্শ্বে বকুল গাছের শ্রেণী। যাবতীয় বকুল বৃক্ষের অগ্রভাগ এক রেথায় অবস্থিত; কেহ কাহা হইতে উচ্চনীচ নহে। প্রায় বার মাসই ঐ পথের উপর বকুল—ফুল রাশি—পড়িয়া সুরভিময় শয্যা রচনা করিয়া রাথে। বালক বালিকারা ঐ কুসুম শয্যায় [illegible]নোপবেশন করিয়া ক্রীড়া করে। এতদ্ব্যতীত অশ্বথ, বট, [illegible]ব, আমলকী, হরিতকী, নাগকেশর, খদির, ভূর্জ্জপত্র, শ্বেতচন্দন, তমাল, লবঙ্গ, দেবদারু প্রভৃতি দেবপ্রিয় ও বৃহৎ তরু সকল স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। উদ্যানের এক ভাগে আম্র, নারিকেল, গুবাক, দাড়িম্ব, প্রভৃতি দেশীয় এবং অন্য ভাগে নানাবিধ বিদেশীয় ফলের বৃক্ষ।

সরোবরের দক্ষিণদিকে সৌধ সোপান। ঐ সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে দুইটী শিবমন্দির। এই পুষ্করিণীর পবিত্রোদকে স্নান করিয়া যথেচ্ছ কুসুম চয়ন ও মন্দিরস্থ শিবপূজায়, অন্তঃপুরিকাগণ ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। দ্বিজরাজ মধ্য গগনে বিরাজমান। দিবালোকবৎ জ্যোৎস্নার প্রভাবে চন্দ্রমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রগণ অদৃশ্য প্রায়। সুধাপিপাসু চকোর, চন্দ্রমার এত নিকটস্থ হইয়াছে যে, ভ্রমরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তরঙ্গায়িত শুভ্র মেঘমালা, নীলাভ অনন্ত গগনে অনন্ত জলনিধির বালুকাপুলিনবৎ প্রতীত হইতেছে। কোথাও বা একটী বৃহৎ ধূমকেতুর বিশালপুচ্ছ, গগনার্ণবপোতের গুণবৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। নক্ষত্ররূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বেশ্বরের গগনাঙ্গনে বিক্ষিপ্ত হইয়া বালিকা-কুলের চৌদ্দ-প্রদীপবৎ মিট মিট করিতেছে। পাঠক, ভূতলে অবতরণ কর। অনন্ত আকাশের অনন্ত মহিমা অনুভব করা মানুষের অসাধ্য।

সরসীর বিমল জলে ধীর সমীরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়াছে। তরঙ্গগণ, শশাঙ্কবিম্ব লইয়া খেলিতেছে। সুধাংশু-দেব যেন, সরসীশোভায় বিমোহিত ও বিগলিত হইয়া শতধা বিভক্ত হইয়াছেন। একান্তে কুমুদিনী "বাসি ধোপ" কাপড় পরিয়া নায়ক সমাগমের প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটীপেচক, ছুছুন্দরীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সচীৎকারে সরোবরের এক পার হইতে অপর পারে উড়িয়া গেল। একদল মৎস্য শাবক চন্দ্রা-লোকে ক্রীড়া করিতেছিল ;—পেচকের পক্ষস্বননে চকিত হইয়া জলোচ্ছ্বাস পূর্ব্বক নিমগ্ন হইল। কামিনী ও শেফালী সুন্দরী, ভক্তিভাবে শরদিন্দুর পূজা সমাপন করিয়া নির্ম্মাল্য কুসুমাঞ্জলি,

সরোবর তীরে নিক্ষেপ করিতেছে। বালবিধবা বঙ্গ সুন্দরীগণ বসনাভরণ বিহীন হইয়াও সৌন্দর্য্যের রাশি,—তাঁহাদের শরীর "অনাঘ্রাত কুসুম ও নখাঘাত বর্জ্জিত" নবপল্লবের স্বরূপ —বিলাস ও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্বভাব,—নয়ন তৃপ্ত করে, কি হৃদয় দগ্ধ করে, বলিতে পারি না। বেল, মল্লিকা, যূথিকা ও রজনীগন্ধা এই চারিজনও সেইরূপ সুন্দরী,—নিস্তব্ধ রজনীতে চন্দ্রিকাংশুক পরিধান করিয়া সংসারকে ঔদাসীন্য ব্রত শিক্ষা দিতেছেন।

এই উদ্যানের উত্তর পার্শ্বেই কপালিনীর গৃহ। কপালিনীর গৃহের যে কোন প্রকোষ্ঠ হইতে উদ্যান শোভা অবলোকন করা যায় এবং ঐ সকল প্রকোষ্ঠ নিয়তই কুসুমসুরভিসংসর্গে আমোদিত থাকে। আজ কপালিনীর নিদ্রা নাই। এই গভীর নিশায় একটি বাতায়ন সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক চন্দ্রিকালোকে ফুটন্ত ফুলের শোভা দেখিতেছেন। ভাব অপ্রসন্ন—উদ্বিগ্নের ন্যায়। তেমন স্বর্গীয় শোভাতেও যেন মন টলিতেছে না। যেন ফুলের শোভায় তৃপ্তি না হওয়ায় চন্দ্রপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-ছেন,—আবার চন্দ্র শোভায় অতৃপ্ত হইয়া অধোবদনে ফুলে ফুলে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। এই সময়ে উদ্যানপ্রাচীরোপরি একটী পুরুষ, বহির্দ্দিক হইতে আরোহণ করিলেন। প্রাচীরের এই স্থান হইতে কয়েক হস্ত দূরে একটী চম্পক বৃক্ষের শাখা, প্রাচীরের এত নিকটে আসিয়া ছিল যে, প্রাচীর হইতে তাহা সহজেই ধরা যায়। পুরুষ, সেই শাখাবলম্বনে উদ্যান মধ্যে অবতরণ করিয়া, গোপন ভাবে, কপালিনীর গৃহাভিমুখে, গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ভীমের অবরোধ।

খুড়াকে ধৃত করিবার ভার, দেবেশ বাবুর প্রতি অর্পিত হইলে, তিনি অনুসন্ধানার্থ নানাস্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। কয়েকজন প্রণিধি নিয়ত খুড়ার বাড়ী পাহারা দিত। তাহাদের দ্বারাই তিনি খুড়ার গৃহাগমনাদি জানিতে পারিয়া সুরাবিপণিতে তাঁহাকে ধৃত করিলেন এবং নিজ বাসোদ্যানে আনিয়া সে রাত্রির মত তাঁহাকে একটি নির্জ্জন গৃহে রাখিয়া দিলেন। তখন রাত্রি দ্বি প্রহর অতীত প্রায়।

দেবেশ বাবু শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন,—"রায়হাটের এক কণ্টক অপসারিত হইল। এখন পামর গুরুচরণের কিছু শাস্তি হওয়া আবশ্যক। তাহার অত্যাচার অসহনীয়। আমি মনে করিলে, এখনি তাহার শিরশ্ছেদ করাইতে পারি, কিন্তু কোন অপরাধীকেই শারীরিক গুরুদণ্ড দানে মন প্রশস্ত হয় না। ঘটনাবশতঃ যাহাই হউক, কিন্তু পূর্ব্বে সংকল্প করিয়া প্রাণদণ্ড করা যাইতে পারে, পৃথিবীতে এরূপ অপরাধ কই? রাজা

সময়ে সময়ে প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়া থাকেন বটে,—সে লোকশিক্ষার্থ,—সমস্ত শরীর রক্ষার জন্য বিষাক্ত অঙ্গুলি কর্ত্তনের ন্যায়। সুবিশাল সমাজশরীরের হিতসাধনই রাজার উদ্দেশ্য। আমার সে অধিকার নাই। আমার বিবেচনায়, হরিমতিকে ব্যভিচারিণী করার জন্য ভীমও গুরুচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুক। কলঙ্ক যতদূর হইবার,—হইয়াছে; এখন আর সে আশঙ্কা নাই। এখন ভীম কোথা?" দেবেশ বাবু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে জনৈক দ্বাররক্ষী আসিয়া কহিল,—"একজন ব্রাহ্মণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার নাম ভীম। কি অনুমতি হয়?"

দেবেশ বাবু ভীমের নাম শুনিয়া যেন একটু বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন;—"এইরূপ ঘটনাকেই, প্রেততত্ত্ববাদিগণ ভৌতিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। ভীমের চিন্তা, এখনও আমার মন হইতে যায় নাই, এদিকে ভীম দ্বারে উপস্থিত। হিন্দু দার্শনিকেরা ইহাকেই 'কাকতালীয়' ন্যায় বলেন। যাহা হউক, ভীম বহুকালের পর হঠাৎ এতরাত্রে আমার নিকট কেন আসিল?" দ্বারীকে আদেশ করিবামাত্র সে ভীমকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিল। পাঠক, হরিমতির ঘরে গুরুচরণের বক্ষোদেশে যে সংহারমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এ সেই মূর্ত্তি। দেবেশবাবু ভীমের এই ভীমমূর্ত্তি দর্শনে চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—

"একি! ভীম, একি!" ভীম উত্তর করিল,—

"বাবু আজ গুরো খান্‌সামাকে নিকেস্ করেছি। এই ছুরী তার বুকে বসিয়ে দিইছি। আমারে বাঁচাতে হবে।"

"ভীম, বল কি? গুরোকে একে বারে নিকেস্ করেছো? ভাল কর নাই। তোমাকে এ কুপরামর্শ কে দিলে?"

"একেবারেই নিকেস্ করেছি, তবে তার বরাৎ থাকে বেঁচে উঠ্‌বে।"

"ভাল! কিরূপে কি ক'র্‌লে, সব বল দেখি!"

"আমি আপনাদেরই এক জন মফঃস্বল নায়েবের বাসায় ভাত রাঁধি। কাল রাত্রে এক জায়গায় কয় জনে তাস খেল্‌ছিলাম। তারা আমার পরিবারের কথা সব জানে। তারা যখন তখন বলে, 'এরূপ ঘটনা এখানে হ'লে, আমরা গুরোরে খুন্ কর্‌তাম। তুমি গরু,—তাই সে তোমার স্ত্রী কেড়ে নিয়ে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।' কালও তারা আমায় এই কথা বলে। এই কথা শুনে আমার গা জ্বলে গেল। আমি কাল শেষ রাত্রেই সেখান থেকে বেরিয়ে আজ দুপুর বেলা এখানে এইছি। সমস্ত দিন সেধো শুঁড়ীর দোকানে লুকিয়ে ছিলাম। গুরো যাবার আগে হরিমতির মাট্‌কোটার ছাদে গিয়ে ব'সে ছিলাম।" ভীম এই সব বলিয়া যেরূপে গুরুচরণকে প্রহার করিয়াছিল এবং ছাদের উপর হইতে তাহাদের যে সকল কথোপকথন শুনিয়াছিল, সবিশেষ বর্ণন করিয়া আবার কহিল—

"আমি যখন যাই, পথে গুরোকে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। তার কথায় বোধ হ'লো, সে আমায় চিন্তে পেরেছিল। এখন সেই শালীকে (হরিমতিকে) একটু জব্দ কত্তে পাল্লে হয়। যাহোক্, আমি এই রাত্রেই পালাবো। বাবু, আমি কি মারা যাবো?" দেবেশ বাবু কহিলেন,—

"তোমায় পালাতে হবে না। তুমি আমার এখানে চাকরী

পাবে। কিন্তু আমার বিনা অনুমতিতে এই বাগানের বাহিরে যেও না।”

“যে আজ্ঞে!”

দেবেশ বাবু ভীমের অজ্ঞাতে অনুচরগণকে ভীমের প্রতি গোপনে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়া দিলেন। ভীমকে গাত্র ধৌত ও বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামের আদেশ দিলেন। ভীম, অনৈক ভৃত্যের সহিত গৃহান্তরে প্রস্থান করিল।

দেবেশবাবু ভীমের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে একখানি পত্র দিয়া একজন দূতকে কোথায় প্রেরণ করিলেন এবং অশ্বপালকে একটী অশ্ব প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। অশ্ব প্রস্তুত হইল। এত রাত্রিতে তিনি কোথা যাইবেন, কেহই জানিতে পারিল না। দেবেশ বাবু আপাদমস্তক কৃষ্ণপরিচ্ছদে আবৃত হইয়া একটি মুখ-কোষ ধারণ পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন। বল্গাকর্ষণ করিবামাত্র অশ্ব, পক্ষিবৎ উড়িয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

গুরুচরণের গঙ্গাযাত্রা।

ভীম, হরিমতির মাটীকোটা হইতে নামিয়া একটী দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। গুরুচরণকে অস্ত্রাঘাত করিয়াই ঐ দ্বার দিয়া বেগে পলায়ন করিল। গুরুচরণের ভীষণ চীৎকারে হরিমতি নিদ্রোত্থিতা হইয়া দেখিল, তাহার শয্যা শোণিত-প্রবাহে ভাসিতেছে! এই ব্যাপার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া সেও, চীৎকার করিয়া উঠিল। গুরুচরণ কিয়ৎকাল ছট্ ফট্ করিয়া নীরব ও নিষ্পন্দ হইল। ইতিমধ্যে একটি স্ত্রীলোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই হরিমতির মুখ চাপিয়া ধরিল। ইনি হরিমতির জননী। হরিমতিকে গোল করিতে নিষেধ করিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কিরূপে কি হইল, হরিমতি তাহার কিছুই জানে না। সুধাময়ী এ বিপদে কাহার সহিত পরামর্শ করিবেন? তাঁহার প্রধান পরামর্শের পাত্র রামশঙ্কর ঘোষাল ছয়মাস নিরুদ্দেশ। তিনি এজন্য প্রতিদিন রাখালদাসের মৃত্যুকামান

না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এই সকল নিমিষমধ্যে চিন্তা করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই গোলযোগে পাড়ার কেহ জাগরিত হইয়াছে কি না,—কোন দিক হইতে তাঁহাদের বাড়ীর দিকে কেহ আসিতেছে কি না, চকিতবৎ এক বার বাড়ীর বাহিরে গিয়া সন্ধান করিয়া আসিলেন। পল্লী নীরব এবং পন্থা বিজন দেখিয়া রাখাল দাসকে জাগরিত করিয়া কহিলেন,—

"এই বিপদ উপস্থিত, চল! তুমি, আমি এবং হরিমতি, তিনজনে ধরাধরি কোরে একে (গুরুচরণকে) গঙ্গায় ফেলে আসি। নহিলে গোষ্ঠী শুদ্ধ মারা যাবো।" রাখাল কহিল,—

"হা দুর্গা, আমার কপালে এই ছিল! যে গুরোখান্‌সামারে চোখে দেখ্‌তে পারি না,—তার মরা, মাথায় বইতে হলো।"—

অধিকতর বিপদের শঙ্কায় তিন জনে ধরাধরি করিয়া গুরুচরণকে গঙ্গায় লইয়া চলিল।

পাঠক, চমৎকার ঘটনা দেখুন! গুরুচরণ চিরকাল ব্রাহ্মণীর সহবাসে কালযাপন করিয়া,—ব্রাহ্মণের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া,—ব্রাহ্মণের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক গঙ্গায় গমন করিতেছে! গুরুচরণের অদৃষ্ট ভাল হইলে তাহাই ঘটিত। কিন্তু তাহা ঘটিল না। পশ্চাদ্ভাগে অতিদূরে এককালে সকলেই অশ্বের হ্রেষা ও পদ শব্দ শুনিতে পাইল। রাত্রি অন্ধকার—কিছুই লক্ষিত হয় না। কিন্তু শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী ও স্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিমিষ মধ্যে জনৈক অশ্বারোহী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া রাখাল দাস প্রভৃতি গুরুচরণকে পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া অন্য পার্শ্বে

গিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী পুরুষও সেই স্থানে অশ্ববেগ সংযত করিয়া কহিলেন,—

"তোমরা যে, যেথানে আছ, সেই খানেই থাক, পলাইবার চেষ্টা করিলে বিপদে পড়িবে।" এই কথা বলিতে বলিতে অদূরে আলোক দৃষ্ট হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে কয় জন পুলিস্ প্রহরী এবং রায়হাটের থানার দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বারোহী পুরুষ আলো ধরিয়া দেখিলেন, তখনও অল্প অল্প শোণিত নির্গত হইতেছে, জীবনের কোন লক্ষণ অনুভূত না হইলেও সে রাত্রির মত গুরুচরণকে ডাক্তারখানায় এবং রাখালদাস প্রভৃতিকে থানার গারোদে রাখিতে দারোগাকে আদেশ করিয়া অশ্বারোহী প্রস্থান করিলেন।

এই অশ্বারোহী পুরুষকে পাঠক অবগত আছেন। তিনি বাসোদ্যান হইতে পত্রসহ যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেও অশ্বারোহণে রায়হাটের থানায় আসিয়া পত্র প্রদান করে। পত্র পাইয়াই দারোগা অনুচরগণসহ গ্রামের প্রান্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেবেশ বাবু তাহাদিগকে লইয়া প্রথমেই রাখালের বাটী অবরোধ করেন। বাটীতে মালিনী ব্যতীত আর কাহারও সন্ধান না পাইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে ভীষণবেগে অশ্ব চালনা করেন। রাখাল দাস প্রভৃতি গুরুচরণকে গঙ্গায় ফেলিতে গিয়াছে বলিয়া যে অনুমান করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাহার প্রমাণ পাইলেন। পাদচারী দারোগা প্রভৃতি কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় আসিয়া মিলিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

দেবেশ বাবুর তপস্যা।

জ্ঞানাভ্যাসই পরম শ্রেয়ঃসাধন। জ্ঞানব্যতীত মানুষের আর সদ্গতি নাই। প্রতিদিন নব নব জ্ঞানোপার্জ্জনেই, প্রীতি ও তৃপ্তি নিয়োজিত। দার্শনিকেরা ভজনীয় পদার্থের অনুসন্ধানকেই জ্ঞান কহিয়া থাকেন। ইহা পরম সত্য। যেহেতু জ্ঞান হইতেই ঈশ্বর চিন্তার উদ্রেক হয়। জ্ঞানজাত ঈশ্বর চিন্তাই, ধ্যান বলিয়া কথিত হয়। অপূর্ণ মনুষ্য, সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ধ্যানে অসমর্থ হইলেও, তচ্চিন্তাজনিত ফললাভে বঞ্চিত হয় না। নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় মন, ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়। ঈশ্বরনিষ্ঠতাকেই শমগুণ কহে। এই শমগুণ হইতে কর্ত্তৃত্বের নাশ ও বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। কর্ত্তৃত্ব বিনষ্ট হইলে, কৃতকর্ম্মের ফলত্যাগে প্রবৃত্তি হয়। ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া কর্ম্মসাধন ও ভগবানের প্রতি নৈষ্ঠিকী ভক্তি প্রদর্শনই পরম পুরুষার্থ। কর্ম্মফল ত্যাগে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা এবং জীব তাঁহার দাস, এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়া আবশ্যক। মানবজাতির মধ্যে যে

যাহাই করুক, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্যই সিদ্ধ হয়। প্রভুকার্য্য সাধন করিয়া ভৃত্য তাহার ফলভোগী হইতে পারেনা। যিনি সৎ কার্য্যের পুরস্কার ও অসৎ কার্য্যের তিরস্কার হইতে অন্তরিত, তিনিই নিরন্তর শান্তির নিকেতন। দেবেশ বাবু এই রূপ চিন্তা করিতে অভ্যাস করিয়া ছিলেন। এই রূপ চিন্তা সময়ানুসারে, অনেকেরই মন অধিকার করে। কিন্তু দেবেশ বাবু কপালিনীর কল্যাণে এইরূপ চিন্তামাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই; তাঁহাকে এই চিন্তানুরূপ অনুষ্ঠান, আপন জীবনে দেখাইতে হইয়াছিল। গৃহসুখে বঞ্চিত ও হতাশ্বাস হইয়া শান্তির লালসায় তিনি ক্রমে আপনাকে, নির্দ্বন্দ্ব, নিঃস্বত্ব, নিস্ত্রৈগুণ্য পরমযোগীর অবস্থায় লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

এই জগৎ দ্বন্দ্বভাবে আচ্ছন্ন। এই ভাব, প্রত্যেক অণুর উভয় মেরুগত আকর্ষণ ও বিয়োজন শক্তিরূপে অবস্থিত। সুখদুঃখ, আলোকান্ধকার, শীতগ্রীষ্ম, ভালমন্দ, লঘুগুরু, উপকারঅপকার, প্রশংসানিন্দা, অনুরাগবিরাগ, ইত্যাদি দ্বৈতভাবে ভৌতিক জগৎ পরিপূর্ণ। এই ভাবের পরিহার মানুষের অসাধ্যপ্রায়। সুখের দ্বারা দুঃখের এবং দুঃখ দ্বারা সুখের অনুভব হয়। দুঃখের ইচ্ছা না থাকিলেও, সুখেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখবীজ গুপ্তভাবে উপ্ত হয়। এই জগৎ একটী আপণ স্বরূপ। এখানে বিনা মূল্যে কোন সামগ্রী পাওয়া যায় না। সকলেরই উপযুক্ত বিনিময় প্রয়োজন হয়। সুখের বিনিময়ে দুঃখ বা দুঃখের বিনিময়ে সুখ, অবশ্যই দিতে হয়। এই সত্যে বিশ্বাস হইলে দ্বৈতভাব বিনষ্ট হয়। তখন জগতের কোন বস্তুই

অপ্রিয় বা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়না। তখন দ্বন্দ্ব পদার্থের উভয়কে, উভয়ের কার্য্য ও কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই বোধ হইতেই, সুখের ও দুঃখের অভিভব দূর হয়। এই রূপে যিনি সুখদুঃখাদির একতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই নিদ্দ্ব র্ন্দ্ব কহে। মানবগণ নির্দ্দ্বন্দ্ব হইলে, সংসারের বিপদ সম্পদ অবিকৃত ও অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিতে সমর্থ হন। জীবন-যুদ্ধে অকুতোভয় হইয়া সংসাররূপ রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতে পারেন। সুখের জন্য লালায়িত, দুঃখভয়ে ভীত, আলোকে প্রফুল্ল বা অন্ধকারে বিষণ্ণ হয়েননা।

ঈশ্বর প্রভু,—আমি দাস,—তাঁহার আদেশ পালনই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। যাহার মনে এইভাব, তিনিই নিঃস্বত্ব। তিনি স্বীয় সুখ্যাতি অখ্যাতি, তিরস্কারপুরস্কার, মানাপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্য সাধন মাত্র করিয়া থাকেন। তিনি মহাপ্রভু সর্ব্বেশ্বরে স্বত্বের সমাধান করিয়াছেন বলিয়া কোন কার্য্যে তাঁহাকে কামনাবৈফল্যের ও আশাভঙ্গের দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। এতাদৃশ ব্যক্তি, প্রস্তরময় সুদৃঢ় ভিত্তির ন্যায়, ভার বহনে সক্ষম।

রজঃ, সত্ব, তমঃ এই তিনটী গুণ এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিন গুণের কার্য্য। এই তিন গুণ ও গুণত্রয় মূলক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াই সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধনের ক্ষমতা মানুষের নাই। এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার কর্ত্তা এক। মানুষ, এক প্রকার সৃষ্ট বস্তু মাত্র। মায়ার ছলনায় অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ করে। এই জ্ঞান ভ্রমসঙ্কুল। এই ভ্রমের অধীনতায় জীব শত শতদুঃখ

ও দুর্দ্দশা ভোগ করে। যিনি এই ভ্রমের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ, তিনিই নিস্ত্রৈগুণ্য,—নিরন্তরশান্ত ও মানব জাতির প্রধান সহায়। যিনি কেবল মাত্র সুখ বা সুখ্যাতি, যশ বা কীর্ত্তির লাভে কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি সমাজ গৃহের একটী শূন্য-গর্ভ ও কীটাকুলিত বাঁশের খুঁটি মাত্র। তাহার উপর কিছুই ভর সয় না। দেবেশ বাবু আত্ম-ব্যবস্থাপন সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তৎকৃত অনুষ্ঠানসকলই তাহার সাক্ষী।

রায়হাটের যেখানে যেরূপ কার্য্য ও সাহায্যের প্রয়োজন হইত, দেবেশবাবু অবাধে তাহা করিতেন। তিনি শত শত বদ্‌মায়েস্‌কে জেলে দিয়াছিলেন, রায়হাটের শত শত দুঃখীর প্রকৃত অভাব দূর করিয়াছিলেন, শত শত অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন, শত শত সাধারণহিতকর কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কোথা হইতে কাহার দ্বারা এই সকল কার্য্য হইতেছে, কেহই তাহা জানিতে পারিতনা। কেহই জানিতে পারিতনা বলিয়াই তাঁহার সকল কার্য্যে সম্যক্‌রূপ কৃতকার্য্য হইবার অণুমাত্র ব্যাঘাত হইতনা। তাঁহার কার্য্য প্রণালীর গুণে, কখন কোন নিরপরাধী, কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ পায় নাই। তাঁহার একটী পয়সা কখন অপাত্রে দত্ত হয় নাই। কখন কোন কপট অর্থী, তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারেনাই। তিনি ঐশ্বরিক প্রকৃতির ন্যায়, অপক্ষপাতসহকারে কার্য্য করিতেন। যে দুঃখ পরিণামে মঙ্গল প্রসব করে, লোকের তাদৃশ দুঃখ দূর করাকে দয়ার কার্য্য মনে করিতেন না। বরং প্রয়োজন হইলে স্থলবিশেষে ঐ দুঃখের বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। যে দুঃখে সুনীতির ধ্বংস ও পারিবারিক অধোগতি হইবার

সম্ভাবনা, তাদৃশ দুঃখ দূরীকরণে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই জন্য তিনি গোপনে মালিনীর দুঃখ সন্ধান করিয়া পত্র সহ তাঁহাকে টাকা পাঠাইয়াছিলেন। পাঠককে এই পত্রখানি শুনাইবার কথা আছে।

"সখি,—

তুমি যেরূপ গুণবতী ও সাধুশীলা, তোমার এ দুঃখ নিতান্ত অদৃষ্টের ফল। আমি জানিতে পারিয়াছি, যে দুঃখ নিতান্ত অদৃষ্টায়ত্ত ও অপ্রতিবিধেয়, তজ্জন্য তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়না। তোমার যে সকল কষ্ট অপরের সাহায্যে দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, তুমি নিশ্চয়ই জানিবে, তোমার সে দুঃখ রহিবেনা। তুমি এই পৃথিবীতেই, তোমার অনুপম চরিত্র ও পবিত্র সতীত্বের কিয়ৎ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। এই পত্র সহ প্রেরিত একশত মুদ্রা অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে ব্যয় করিবে। প্রেরক,—কে, জানিবার যত্ন করিওনা।"

যেখানে প্রকৃত অভাব, সেই খানেই দেবেশ বাবুর এইরূপ পত্র ও অর্থ প্রেরিত হইত। ঐশ্বরিক মঙ্গলভাবের জীবন্ত প্রতিনিধি স্বরূপে, তিনি রায়হাটের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছিলেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিশীথে—সঙ্গীত।

এই গ্রন্থের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে কমল-ভানু-প্রসঙ্গে কপালিনীর স্তা এবং উদ্যান মধ্যে তাদৃশ সময়ে জনৈক পুরুষের সমাগম, ই দুইটি স্থল পাঠে যদি কেহ, কপালিনীর কপাল পুড়িয়াছে, ন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার মহাপাপী। কারণ ক মাত্র ব্যভিচার ভিন্ন রমণীর পাপ নাই,—বিড়ম্বনা ই,—দুর্ভাগ্য নাই। তাঁহারা সহস্রশঃ হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা, র্ষ্যা, পরাপবাদ, কলহ ইত্যাদি জুগুপ্সিত ব্যাপারে দূষিত ইলেও অসতী হন না!! একমাত্র পুরুষাভিলাষই তাঁহাদের সতীত্বের কারণ। রমণীজীবনে সতীত্ব সীমাবদ্ধ। যে ক্তি এই নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট পুণ্যপ্রতিষ্ঠায় দোষারোপের চেষ্টা রে, সে পাপিষ্ঠ নয়ত কি? এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

"মরিল মেয়ে উড়িল ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই"

বঙ্গদেশীয় এই প্রবাদের অর্থ আছে। রমণী সহস্র গুণে গুণান্বিত হইলেও তাঁহার সঙ্কীর্ণ সতীত্ব-পদ, নিরাপদ নহে। কিন্তু যাঁহার তেজ আছে, তাঁহার চিতাভস্ম গগনমণ্ডলে উড্ডীন হইবার অনেক পূর্ব্বেই "গাওয়া" যাইতে পারে যে, তিনি সহস্র দোষে দূষিত হইতে পারেন,—কিন্তু ব্যভিচারিণী হইতে পারেন না। কপালিনী সেই তেজের আধিশ্রয়ণিকব্যবধি।* পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, তিনি কখন দিবাকর-করে দগ্ধ হইয়াছেন কিনা ইহা মনে করিতেও অসমর্থ হইয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় তেজঃপূর্ণ কমলিনী, দেবেশ বাবু তাঁহার সহস্র-রশ্মি দিবাকর। বাল্য-ভ্রম, অনভিজ্ঞতাদি দোষে দেবেশ বাবুর যে সকল ব্যবহার কপালিনীর স্বপ্রতিকূল বলিয়া সংস্কার জন্মে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে দেখিয়া শুনিয়া ক্রমশঃ তাহার অপনোদন হইতেছিল। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে যে দিনকার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে,সে দিন তিনি পতির প্রতি স্বকৃত অযথা ব্যবহার জন্য অনুতাপিনী। উষ্ণজল সঞ্চালিত হইলে, আভ্যন্তরিক তাপ বাষ্পাকারে বহির্গত হয়। কপালিনী সে কৌশল অবলম্বনে নয়নপথে বাষ্প বিমোচন করিয়া মনোদুঃখের লাঘব করিতে অপটু। তিনি আভ্যন্তরিক তাপে নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কি জন্য কি হইয়াছে, তিনি তাহা বুঝিলেন, কিন্তু বুঝিলে কি হয়? তখনও দুষ্টা সরস্বতী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তখনও দুষ্টা সরস্বতীর কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। তখনও তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"মরিব,—তবু হারিব না!" নতুবা সহজেই

* Focus. তেজোহংশুর বিকীরণ স্থল। যে স্থলে তেজ ঘনীভূত হয়।

সকল জ্বালার শেষ করিতে পারিতেন। যেহেতু দেবেশবাবু কপালিনীর নিকটেই ছিলেন। মধ্যে মধ্যে গোপনে স্বয়ং আসিয়া এবং লোক পাঠাইয়া তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। এই জন্যই আমরা পূর্ণিমার দিন গভীর নিশায় চম্পক শাখাবলম্বনে পুরোদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাঁহাকে কপালিনীর গৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়া ছিলাম।

পাঠক মনে করিতেছেন, দেবেশ বাবু "পর্য্যুষিত চুল্লীর পাংশু" কিংবা প্রভাতকালীন স্তিমিততেজ খদ্যোতিকাবৎ হীনপ্রতাপ। যে, তাঁহাকে সহস্র-রশ্মি দিবাকর বলে,—সে নিতান্ত অর্ব্বাচীন। যে কপালিনী পদে পদে তাঁহার অপমান করিয়াছে,—দাম্পত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া পদে পদে তাঁহার মনে ব্যথা দিয়াছে,—কখন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার অনুরাগ ও স্নেহ প্রত্যাশায় হৃদয়কে বিনম্র করে নাই, সেই কপালিনীর চিন্তা এখনও তাঁহার মনে প্রভুত্ব করিতেছে! তাঁহাকে ধিক্!

কথা সত্য। কপালিনীর চিন্তা দেবেশ বাবুর হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তজ্জন্যই কি তিনি অসার ও অপদার্থ হইবেন? কপালিনীর অপরাধ কি? তিনি তাঁহাকে সুখী করেন নাই। রায়হাটের কে তাঁহাকে সুখী করে? তিনি শত শত নিঃসম্বন্ধ লোকের তত্ত্ব লইয়া থাকেন। কপালিনীর তত্ত্ব, কেন লইবেন না? এ কথার উত্তর আছে। কপালিনীর তত্ত্ব কেন লইবেন? কপালিনীর নিকট তাঁহার অনেক প্রাপ্য। তিনি দেবেশ বাবুকে ন্যায্য স্বত্বে বঞ্চিত করিয়াছেন। যে, বিহিত স্বত্বে বঞ্চিত করে, সে কেবলমাত্র অপ্রিয় নহে,—শত্রুর মধ্যে পরিগণিত। এ তর্ক যুক্তিযুক্ত হইলেও, দেবেশ বাবুর

মনে কখনই তাহা উদিত হয় নাই; কারণ তিনি কপালিনীকে ভাল বাসিতেন;—"ভালবাসার সাত খুন্ মাপ।" প্রীতি রাজ্যের বণিকগণ এ সিদ্ধান্তে কখনই তুষ্ট হইবেন না। কেন না তাঁহারা বিনিময় চাহেন। যে আমায় সুখী করিবে না, আমি তাহাকে ভাল বাসিব কেন? এই প্রীতি আত্মসুখ-কামময়ী। দেবেশ বাবু এতাদৃশী প্রীতিকে তাদৃশ আদর করিতেন না। পরসুখ-কামিনী প্রেমময়ী প্রীতিতে তাঁহার হৃদয় মাতিয়া ছিল। সেইজন্য তিনি পুনঃ পুনঃ কপালিনীর তত্ত্ব লইতেন। আজ কপালিনীর অবস্থা অবগত হইবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছেন।

দেবেশ বাবু কপালিনীর বাস গৃহের বাতায়নসন্নিকটে এমন ভাবে দণ্ডায়মান্ হইলেন যে, কপালিনী কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তিনি কিয়ৎকাল, চন্দ্রিনী রাত্রি, পূর্ণচন্দ্র, ফুটন্ত ফুল, শীতলবায়ু এই সকলের বিনিময়ে বিধাতার চরণে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। রজনী গভীর,—চতুর্দ্দিক নীরব। মধ্যে মধ্যে কোকিল, ফিঙ্গা, শ্যামা প্রভৃতি কৌমুদীপ্রিয় বিহঙ্গগণ কলরব করিয়া নিশার নিস্তব্ধতায়, মাধুর্য্য মিশাইয়া দিতেছে। এই নিধুবন নিনাদী মধুময় বিহঙ্গসঙ্গীতের সঙ্গে, ঝিল্লী, গায়কের তম্বুরা, কিংবা সানাইদারের "পোঁধরার" কার্য্য করিতেছে। জীবজন্তুর অজ্ঞাত দেবকার্য্য সাধনোপযুক্ত দেবাধিকৃত এই মধ্যনিশায় অশ্বত্থরূপী ভগবান্, পবনদেবের সহিত অব্যক্ত দেব-ভাষায় কি পরামর্শ করিতেছেন; [illegible]পালক দৃঢ়মূর্ত্তি ঝাউ, অভ্রভেদী মস্তক মুহুর্মুহু আন্দোলিত করিয়া আদেশ বহন করিতেছে। দেবেশ বাবু শুনিতে পাইলেন, একটী সঙ্গীতের মধুর

তরঙ্গ, ঐ দৈবী ভাষায় মিশিয়া যাইতেছে। রজনীর বিচিত্রা গতি পদে পদে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। তাঁহার বোধ হইতেছিল, দূরস্থ কোন সঙ্গীত-লহরী নীরব নিশায় স্থির বায়ু সহকারে গগন মণ্ডলে বাহিত হইতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন, উহা কপালিনীর গৃহ হইতে,—কেবল মাত্র গৃহ হইতে নহে,—গৃহস্বামিনীর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতেছে। দেবেশ বাবু জানিতেন, মনে দুঃখ হইলে, কপালিনী গান করিয়া থাকেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গৃহ-লক্ষ্মী।

খুড়া দেবেশ বাবুর বাসোদ্যানে এক রাত্রির জন্য অবরুদ্ধ আছেন। তিনি অত্যন্ত চতুর, কার্য্যদক্ষ ও সাহসী। এইবার তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত হইলেও তিনি ভগ্নোৎসাহ হন নাই। বিপদ নিপতিত, কিন্তু বিপদভারে তাঁহার মস্তক অবনত হয় নাই। যে ব্যক্তি এক পাপের দণ্ডে পতিত হইয়া, অন্য পাপের চিন্তা করে, খুড়া সেই ধাতুর লোক। দ্বিতীয় স্বভাব অভ্যাস, তাঁহার মনুষ্যত্বের আসন হরণ করিয়াছিল। অন্তঃকরণ পাপচিন্তায় ভীত [illegible] না,—কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিত না। যাহা হউক তাঁহার পূর্ব্বকথিত অপরাধ সকল সপ্রমাণ হওয়ায়, এই অবরোধই, পরিণামে, যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

ভীমের ছুরিকা গুরুচরণের [illegible]যন্ত্র ভেদ করে নাই, এক পার্শ্বে প্রবেশ পূর্ব্বক যন্ত্র স্পর্শ [illegible]য়াছিল মাত্র। গুরুচরণের

মৃত্যু হইলে ভীমও, বিলক্ষণ বিপদে পড়িতেন। বিশেষতঃ তাঁহার শাশুড়ীর যত্নে ঐ বিপদ নিতান্ত আসন্ন হইয়াছিল। কেননা তিনি জীবিতাবস্থাতেই গুরুচরণকে গঙ্গা সমর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এজন্য ভীম, দেবেশ বাবুর উদ্যানে অবরুদ্ধ হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পুণ্যে ক্রমশঃ গুরুচরণের মৃত্যুভয় অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভীমও মুক্তি পাইলেন এবং কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গুরুচরণ ভীমের অস্ত্রাঘাতে মৃতবৎ হইয়া রায়হাটের দাতব্য চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সুধাময়ী ঘোর পাপিনী! স্বয়ং সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। প্রাণপ্রিয়া কন্যা হরিমতিকে তিনিই ব্যভিচারিণী করেন, এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনিই ভ্রূণহত্যার প্রধান সহকারিণী। তিনিই মালিনীর মাথা খাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বহৃদয়ই স্বর্গ,—স্বহৃদয়ই নরক! অল্প প্রয়াসে অভ্যাস দ্বারা প্রকৃতিকে পরাজিত করিতে পারা যায়। যত দিন অভ্যাসের প্রভুত্ব না হয়, ততদিন স্বকৃত পাপপুণ্য, স্বহৃদয়ে প্রভুত্ব প্রকাশ করে। সুধাময়ীর হৃদয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হইতে হইতেই, তিনি দেবেশ বাবু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুলিসে প্রেরিত হন। দেবেশ বাবুর পূর্ব্বাবধি সুধাময়ীকেই সমধিক দুঃশীলা বলিয়া সংস্কার ছিল। আবার অস্ত্রাহত গুরুচরণ বিষয়ক ঘটনায় তাহারই বিশেষ প্রমাণ পাইলেন। কেন না, সুধাময়ী ভীমকে না দেখিয়াই ঘটনাবগতিমাত্র বুঝিলেন যে, ইহা ভীমেরই কার্য্য। তজ্জন্য ভীমকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার উদ্দেশে আহত গুরুচরণের অবশিষ্ট জীবন হননে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুধাময়ী খুড়ার পাপ-সহকারিণী। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে কোন দণ্ড পাইতে হয় নাই। কারণ মালিনীর মতেই রাখালের মত; সুধাময়ীর দোষ সকল, বিচারালয়ের গোচর করিতে মালিনীর মত ছিল না। খুড়ার মোকদ্দমাকালে তিনি এইরূপে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। দুই একটী পাপক্রিয়া বিনাদণ্ডে অতিক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু পাপাসক্ত ব্যক্তির শাস্তি অপরিহার্য্য। শেষে দেবেশ বাবু প্রমাণ পাইলেন, সুধাময়ী জানিয়া শুনিয়াই জীবিত গুরুচরণকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাখালদাস ও হরিমতি তাহাতে আপত্তি করায়,—"গুরুচরণ অল্পক্ষণ পরেই মরিবে,—তাহাতে অধিক বিপদের শঙ্কা আছে, —" ইত্যাদি প্রকার বলিয়া সে আপত্তির খণ্ডন পূর্ব্বক গুরুচরণকে গঙ্গার গভীর জলে নিক্ষেপ করাই স্থির করেন। যাহা হউক, সে ঘটনায় রাখালদাস ও হরিমতি নিষ্কৃতি পাইলেন, গুরুচরণকে হত্যা চেষ্টার অপরাধে সুধাময়ীর দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড হইল। অন্তর বাহিরে অগ্নি সংযোগ হইল! সুধাময়ীর পাপ প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্ব আয়োজন পূর্ণ হইল!

গুরুচরণের সহিত হরিমতির ব্যভিচারের কথা পূর্ব্ব হইতেই রায়হাটে প্রচারিত হয়। কিন্তু উক্ত ঘটনা হইতে হরিমতির লজ্জা ও কলঙ্কের ভার দুর্ব্বহ হইয়াছিল। অধিকন্তু তাদৃশ গুণের জননী ও গুরোদাদার বিরহে সে আপনাকে নিতান্ত অসহায়া জ্ঞান করিতে লাগিল। হরিমতির জন্য যে সকল লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি মালিনী ও রাখালদাসের কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। যে, একবার সুনীতির শাসন অতিক্রম পূর্ব্বক স্বকীয় পবিত্র চরিত্র কলঙ্কিত করে,

সাধুতা রক্ষায় তাহার আর কিছুমাত্র যত্ন থাকে না। প্রত্যুত পদে পদে অধঃপতিত হয়। হরিমতি উদ্বেল ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়াছিল, মনকে ফিরাইবার ইচ্ছা থাকিলেও ফিরাইতে পারিল না ; বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিল। সে, যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, গৃহত্যাগ ভিন্ন তাহার উপায়ান্তরও ছিল না। এতদিন সে বাপের বাড়ীর ঝী ও শ্বশুর বাড়ীর বউ হইয়াই স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিত। এখন তাহার পাপের প্রকৃত শাস্তি আরম্ভ হইল।

জননীর ফাটক হইল,—ভগিনী গৃহত্যাগ করিল,—রাখালের ভিটা নিষ্কণ্টক হইল। কিন্তু রাখালের সুখ নাই। দারিদ্র্যের কশাঘাতে—কতক ইচ্ছায়,—কতক অনিচ্ছায়,—তিনি সকল পাপেই জড়িত ছিলেন। কৃত পাপের জন্য অবস্থা বিশেষ দায়ী নহে। ঘটনানুকূল্যে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, কিন্তু প্রাকৃতিক দণ্ড অপরিহার্য্য। লজ্জা, ঘৃণা, অনুতাপ, অপমান, শোক প্রভৃতি অন্তঃশত্রুগণে তাঁহাকে বিলক্ষণ পীড়ন করিতে লাগিল। পাপ,—শরীরে কৃত হউক,—বাক্যে কথিত হউক,—মনে চিন্তিত হউক,—কোন রূপেই তাহার দণ্ড হইতে নিস্তার নাই। আপনি আপনাকে নিষ্পাপ বলিয়া না জানিলে, সুখও নাই,—শান্তিও নাই। অন্যে তোমায় পবিত্র বলিয়া জানিতে পারে, কিন্তু তুমি তাহার মন লইয়া সুখী হইতে পার, এরূপ কোন উপায় নাই। রাখাল নিতান্ত অপাত্র হইলেও, মালিনীর সংসর্গ পাইয়া অবধি কোন অসৎ কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা হন নাই। তথাপি তাঁহার সুখ ছিল না।

মালিনী অপাপ-বিদ্ধা—তিনি মনেও কখন পাপের সঙ্কল্প

করেন নাই। সংসর্গ দোষে অনেক অসুখ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অসুখ অন্যবিধ,—মনের অপবিত্রতা হইতে যে অসুখ উৎপন্ন হয়,—তাঁহার অসুখ সেরূপ নহে। তাঁহার অসুখ ক্ষণিক,—নৈমিত্তিক,—মনের উপরিভাগে ভাসমান। পাপজ দুঃখ নির্ম্মূল হয় না। যখনই আত্ম-কৃত পাপ স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তখনই অন্তর্দাহ উপস্থিত করিবে। নিমিত্ত ও কালের সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখ অন্তরিত হয়, মালিনীর দুঃখ সেইরূপ। রাখালের দারিদ্র্য এবং সুধাময়ী ও হরিমতির দুশ্চরিত্রই, তাঁহার যাবতীয় অসুখের নিমিত্ত। সুতরাং শ্বশ্রূ ও ননন্দার গৃহত্যাগ এবং দেবেশ বাবুর আর্থিক সাহায্যে ক্রমশঃ মালিনীর মনোমালিন্য দূর হইয়াছিল।

কালসহকারে রাখালের সাংসারিক সুখ ও শৃঙ্খলার একটু বৃদ্ধি হয়। ভগিনী ও জননীর দুর্ব্যবহার জন্য দুর্নামাদি অন্তরিত হয়। তাঁহাদিগের গৃহে অন্নাদি গ্রহণে আর কাহারই কোন আপত্তি ছিল না। রাখালের দুইটী পুত্র উত্তম রূপে লেখা পড়া শিখিয়াছিল। উত্তম ঘরে পুত্র কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। মালিনীই রাখালের গৃহলক্ষ্মী। মালিনীর পবিত্র চরিত্রই তাঁহার এরূপ পরিণামের হেতু। এরূপ পরিণাম, কেবল ঐ চরিত্রেরই পুরস্কার। সংসার সমুদ্রে মজ্জমান, এই গৃহস্থের কিরূপে উদ্ধার হইল, পাঠক! তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন; কিন্তু ঐ গৃহস্থ কোন কালে তাহা জানিতে পারে নাই। যাহা হউক, রাখাল ও মালিনীকে এই গ্রন্থের এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শব্দটী কি ?

দেবেশ বাবুর অন্তঃপুরোদ্যানের দ্বারসন্নিকটেই একটী বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষটী তাঁহার জননীর প্রতিষ্ঠিত। তলাটি চক্রাকারে শাণ বাঁধান ও পরিষ্কৃত। ঐ দিকে পুরুষের সমাগম প্রায় নাই, কেহ কদাচ গাছতলায় গিয়া থাকে। যে রজনীতে দেবেশ বাবু কপালিনীর বাতায়নসন্নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহার তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে একজন দৈবজ্ঞ, ঐ অশ্বত্থমূলে উপবেশন পূর্ব্বক কাহার কি গণনা করিতেছিলেন। তাঁহার মিষ্ট বাক্যে প্রীত হইয়া অনেক গুলি রমণী তথায় দাঁড়াইয়াছেন। দৈবজ্ঞের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে সকলেরই তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের উদয় হইয়াছে। সকলেই এক একবার আপনার বিষয়টা গণাইয়া যাইবেন, মনে করিতেছেন। ইতি মধ্যে বাবুদের বাড়ীর এক পরিচারিকা সাদরে দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ডাকিয়া লইয়া গেল। দৈবজ্ঞ ঠাকুর কপালিনীর প্রাঙ্গণে আসন প্রাপ্ত হইলেন। শুরু,

পুরোহিত, গণক, রজক, নাপিত, প্রভৃতি কতকগুলি লোক, সামাজিক আইন অনুসারে বিশ্বস্ত এবং গৃহস্থের অন্তঃপুরে গমনের স্বত্ববান্। ক্রমশঃ অনেক গুলি পুরবাসিনী ও প্রতিবেশিনী আসিয়া গর্ণক ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। "আমার প্রোষিত স্বামী গৃহে আসেন না কেন? আমার ছেলের কপালে বিদ্যা আছে কিনা? সিঁতায় সিঁদূর দিয়া মরিতে পারিব কিনা?" ইত্যাদি প্রকার গণনা আরব্ধ হইল।

কপালিনী জনতাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেখিলেন, গণক ঠাকুরের আখড়া ভাঙ্গে না। অনেকে প্রস্থান করিলেও বাড়ীর দুইচারিটী অল্পবয়স্কা ঝী বউ তখনও রহিয়াছে। কৌশলে তাহাদিগকেও স্থানান্তর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"গণক ঠাকুর, বলুন দেখি, আমি বিধবা কি সধবা?" গণক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ও অনেক অঙ্কপাত করিয়া কহিলেন,—

"মা, আপনি বিধবা!"

কপালিনীর চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। গণক ঠাকুর পাছে দেখিতে পান, এজন্য বিশেষ সাবধান হইলেন, কিন্তু লুকাইতে পারিলেন না। গণক ঠাকুর পুনরপি কহিলেন,—

"মা, আমি ভ্রান্ত হইয়াছি! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি, 'আপাততঃ' বিধবা! আপনার স্বামী নিরুদ্দেশ। আপনি তাঁহার জন্য মনে বড় ক্লেশ পাইতেছেন।"

"আপনার পুঁথি পাঁজি গুলি গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রস্থান করুন।" কপালিনী এই কথা বলিয়া তাঁহাকে দুইটী টাকা দিয়া আপনি বেগে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গণক কিয়ৎকাল হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া থাকিয়া প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পরিচারিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দাসী আবার তাঁহাকে কল্য আসিতে অনুরোধ করিয়া প্রতিগমন করিল।

গণক ঠাকুর পরদিন প্রাতঃকালে আবার কপালিনীর গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কপালিনী আবার তাঁহাকে সাদরে বাটীর মধ্যে আনিয়া বসিতে আসন দিলেন। কহিলেন,—

"ঠাকুর আমাকে ক্ষমা করুন। কল্য আপনাকে অকারণে অবজ্ঞা করিয়াছি। আপনি আমার মনের কথা বলিয়াছেন, তবু অবজ্ঞা করিয়াছি। আপনি আর একবার ভাল করিয়া গণনা করুন,—আমি সধবা কি না?" গণক পুনরায় গণনা করিয়া কহিলেন,—

"মা আপনি সধবা।"

কপালিনী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমার স্বামী কোন্ গুপ্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অজ্ঞাত বাস করিতেছেন?" গণক, গণনা করিয়া কহিলেন,—

"আপনার স্বামী নিষ্পাপ।"

কপালিনী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, গণকের কথায় বিশ্বাস হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবে কি জন্য নিরুদ্দেশ?"

"আপনার জন্য!"

কপালিনী তাহাও বুঝিয়াছিলেন। গণক ঠাকুরের কথায় আর ও বিশ্বাস হইল। কহিলেন,—

"আমার স্বামী কোথায় আছেন?"

"আপনার স্বামী নিকটেই ছিলেন, কিন্তু কএক মাস

হইতে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছেন, কোথায় স্থায়ী হইবেন, এখন তাহার গণনা হইতে পারেনা। ”

দেবেশ বাবু রায়হাটের অদূরে কোন পল্লী উদ্যানে বাস করিতেছেন, কপালিনী তাহা জনরবে জানিতে পারিয়াছিলেন। জনরবটী সত্য কি না সন্ধানার্থ কিছু দিন পূর্ব্বে তৎপ্রেরিতা পরিচারিকা ঐ উদ্যানে গিয়া শুনিয়াছিল,তথায় দেবেশবাবু নাই, তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহই তাহা অবগত নহে। সুতরাং গণক ঠাকুরের গণনায় একবর্ণেও কপালিনীর সংশয় রহিলনা। গণক ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“ ঠাকুর, আমার স্বামী কবে গৃহে আসিবেন ? ”

“ মা, আমায় বিদায় দিন, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর শুনিবার প্রয়োজন নাই ”

“ কেন ?”

“ উত্তরটী আপনার মনের মত হইবেনা। ”

“তাহা, আপনি গণনা না করিয়া কি রূপে জানিলেন ?”

“গণনা করিয়াছি।”

“তবে আর কেন ক্লেশ দেন ? বলুন, আমার স্বামী কবে গৃহে আসিবেন ?”

“গৃহে আসিবেন না !”

গণকের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র কপালিনী চমকিয়া উঠিলেন। গণক ঠাকুর অন্তর্যামী,—তাঁহার নিকট বহিশ্চক্ষুর বাষ্প বেগ-সংবরণ চেষ্টা বৃথা ! কপালিনী অসঙ্কোচে অনর্গল অশ্রুবর্ষণ করিলেন। “গৃহে আসিবেন না” কপালিনী এরূপ নিষ্ঠুর উত্তর শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না, আকস্মিক আঘাতে বড়

ব্যথা পাইলেন। দৈবজ্ঞ, তাঁহাকে কাতর দেখিয়া "শান্তি শতক" "মোহমুদ্গর" উদ্ধৃত করিয়া অনেক প্রবোধ দিলেন। অনন্তর প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, কপালিনী পুনরপি কহিলেন,—

"ঠাকুর, আমার স্বামী গৃহে আসিবেন না। তবে কি এ জন্মে আর তাঁহার চরণ দেখিতে পাইব না?"

গণনা বিদ্যার বিচিত্র গতি। গণক ঠাকুর পুনরপি গণনা করিয়া কহিলেন,—"পাইবেন?"

গণকের প্রতি অটল বিশ্বাস। দেবেশ বাবু বাড়ী আসিবেন না, অথচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কপালিনী আকাশ হইতে পড়িলেন। প্রশ্ন করিলেন,—

"কি উপায়ে?"

গণক চক্ষু মুদিয়া ভূমিতে অনেকক্ষণ খড়ি দ্বারা লিখিয়া কহিলেন,—

"মা, যদি আপনার বর্ণজ্ঞান থাকে, তবে পড়িয়া দেখুন! আমার দৈব চালিত হস্ত কি লিখিয়াছে।"

কপালিনী অনেক "হিজি বিজির" মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে একটী শব্দ দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—

"সে কিরূপ?"

"জানি না।"

বেলা দুই প্রহর। গণক ঠাকুর উপযুক্ত দক্ষিণা, সিধা, জলখাবার প্রভৃতি কাপড়ে সাত পোঁটলা বাঁধিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি কপালিনীকে সুখের সংবাদ দিতে পারেন নাই, মনের কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া, এমন উত্তম বিদায় পাইলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

রাঙ্গাবউর প্রতি কপালিনী।

কপালিনীর কিসের দুঃখ? অর্দ্ধরাত্র অতীতপ্রায়! দ্বিজ-রাজ মধ্যগগন পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম-পয়োধি-সলিলে ঝম্প প্রদানের উদ্যোগ করিতেছেন, এখনও কপালিনীর নিদ্রা নাই! তাঁহার জড় সন্তানটীর জন্য তাঁহাকে অধিক দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। কারণ তিনি শিশুর তাদৃশী অবস্থাকে তাহার জন্মান্তরীণ কঠোর পাপের ফল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বিশে-ষতঃ সন্তানটী যতদিন বাঁচিয়া থাকে, কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ না পায়, কেহ কিছুমাত্র অযত্ন না করে, এজন্য তিনি সুন্দর রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি কপালিনীর কিসের দুঃখ? ইহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। জনৈক প্রণিধিকে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া ঐ দুঃখের সন্ধানার্থ নিয়োজিত করিলেন। পাঠক এই প্রণিধিকেই, কপালিনীর গৃহে সেদিন গণক ঠাকুর রূপে দেখিয়াছেন। কপালিনীর গৃহ হইতে

প্রণিধি প্রত্যাগত হওয়ার চারিদিন পরে তাহার মুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবেশ বাবু কহিলেন,—

"প্রণিধি, তুমি কেবল মাত্র আমার ভৃত্য নহ,—তোমাকে বন্ধু বলিয়াও মনে করি। তোমাকে মনের অনেক কথা বলিয়াছি, আজও কিছু বলি। তুমি স্বকর্ত্তব্য উত্তমরূপে সাধন করিয়াও কপালিনীর সম্মুখে শেষ কথাটি লিখিয়া ভাল কর নাই। ইহার ফল মন্দ হইতে পারে।"

দেবেশ বাবু কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ছদ্মবেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার এই ছদ্মবেশের মধ্যে দুইটী দুর্লভ সামগ্রী নিয়ত ছদ্মভাবে রক্ষিত হইত ;—অর্থ এবং অস্ত্র। তিনি ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজনিকেতন, বিচারালয়, কারাগার, পুলিস, পোতাশ্রয়, সেনানিবাস, প্রাচীন দেবমন্দির, তীর্থস্থান, অতিথি-শালা, ধর্ম্মসমাজ, সমাধি, শ্মশান প্রভৃতি দর্শন করিবার অভি-লাষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যে মধ্যে দুই চারিদিনের জন্য বাসোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন এবং গোপনে কপালিনীর তত্ত্ব লইতেন। প্রণিধির মুখে হৃদয়-প্রতিমার মনোদুঃখের বিবরণ অবগত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"যে সংবাদ শুনিবার জন্য এতদিন অনন্য-মনে উৎকর্ণ হইয়াছিলাম, প্রণিধির মুখে আজ তাহা শুনিলাম। প্রিয়া আমার অন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। অতএব যাহাতে শীঘ্র ও নির্ব্বিঘ্নে গণকের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়,—আমার সহ সাক্ষাৎ হয়,—আমার এখন তাহাই কর্ত্তব্য।" এই ভাবিয়া তৎ-ক্ষণাৎ উপযুক্ত উপদেশ দিয়া প্রণিধিকে কপালিনীর নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রণিধি প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, কপালিনী

গৃহ-ত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গিয়াছেন,তাহার সন্ধান নাই! তাঁহার গৃহে তল্লিখিত এক খানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। পত্রখানি দেবেশ বাবুর কর্ম্মাধ্যক্ষের হস্তগত হইয়াছে। গৃহিণীর সন্ধানার্থ নানা স্থানে লোক প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া দেবেশবাবু বিস্মিত হইলেন। কপালিনীর বাল্য চরিত ও চরিত্র স্মৃতিপথে উদিত হইল। শ্মশানভ্রমণ, কালিকার মন্দিরে গমন, নদীনিমজ্জন, সমস্তরাত্রি সিন্দুকের মধ্যে স্থিতি, অকারণে তাঁহার সমক্ষে রাঙ্গা-বধূর অবমাননা, পূর্ণ গর্ভাবস্থায় ক্রোধবশে পিত্রালয়ে গমন,—পথিমধ্যে বজ্রনিনাদে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি,—তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ ভুবনমোহন বেশ ধারণ এবং তাঁহারই একটী সামান্য কথায় সেই বেশের উৎসাদন, ইত্যাদি ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া শঙ্কা ও বিস্ময়ে দেবেশ বাবুর হৃদয় আকুল হইল। ভ্রমণের আর একটী উদ্দেশ্য বৃদ্ধি হইল। কিন্তু কপালিনীর সান্ধানার্থ বাহির হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার পত্র খানি পাঠ করা আবশ্যক বোধ করিলেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, গৃহিণীর সন্ধান পাওয়ার পূর্ব্বে দেবেশ বাবুকে এ সংবাদ দিবেন না। সুতরাং কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট হইতে এ সংবাদ আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, দেবেশ বাবু স্বয়ংই লোক পাঠাইয়া কপালিনীর পত্র আনাইলেন। পত্র খানি রাঙাবউর প্রতি লিখিত। তাহা পাঠ করিয়া দেবেশ বাবু বজ্রাহত হইলেন;—ভাব গম্ভীর, মুখ অপ্রসন্ন ও মন চঞ্চল হইল। পাঠক এই পত্র খানি পরে পাঠ করিবেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

দুর্নিমিত্ত দর্শনে আনন্দ !!

কপালিনীর বাল্যলীলা, বাল্যচরিত, পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে কিছু কিছু বিবৃত হওয়ায়, পাঠক তাহা একরূপ অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনীর একাংশ এখনও অপ্রকাশিত আছে। এই স্থলে তৎসম্বন্ধীয় দুই একটী কথার উল্লেখ আবশ্যক। তিনি পিতার একমাত্র আদরের কন্যা। অধিক পরিমাণে পিতৃপ্রশ্রয় পাইয়া অধিক পরিমাণে পিতারই অনুগত হইয়াছিলেন। বালিকাকালে পিতার ক্রোড় ভিন্ন তাঁহার শয়ন হইত না। প্রতিদিন শয়নকালে পিতার মুখে "শয়নে পদ্মনাভ ;—" ও উত্থানে "কালীতারা—" ইত্যাদি শ্রবণ করিতেন। "কালীতারা" প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা কোথায় থাকেন,—কি করেন,—তাঁহাদের কেমন আকার,—এই সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পিতার নিকট প্রশ্ন করিতেন। পিতাও, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উত্তর দানে প্রিয়তমা কন্যার কৌতূহল নিবারণ

করিতেন। কপালিনীর কালিকার প্রতি ভক্তির উদয় হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে প্রান্তরবর্ত্তী পুরাতন মন্দিরে গিয়া নৃমুণ্ড-মালিনীকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী ঠাকুর কপালিনীর শক্তি-ভক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতার অনুমত্যনুসারে তাঁহাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাদান করিলেন। মহাকাল মহাদেব কালীর পদতলে রহিয়াছেন। কে তাঁহার নিকট এ তান্ত্রিক রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করে? তাঁহার বালিকা-হৃদয়, নিজেই ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমাবর্ত্তে পতিত হইল। স্ত্রী-গণের একমাত্র গুরু ও প্রত্যক্ষ দেবতারূপী প্রাণপতিকে পদদলিত হইবার সামগ্রী বলিয়া তাঁহার সংস্কার হইল!! বালকবালিকার কোমল হৃদয়ে কোন ভাব বদ্ধমূল হইলে চিরকালই তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইতে পারে। এই জন্য পাঠক, এই বালিকার যুবতীজীবনেও ঐ ভাবের ছায়া-দর্শন করিয়াছেন।

দেবেশ বাবুর গৃহত্যাগে, কপালিনীর হৃদয় বাল্যজাত কুসংস্কার মেঘাবরণ হইতে মুক্ত হইল। স্বামীর অবাধ্য হওয়ায় আপনাকে পাপিনী বোধে অনুতাপিনী হইলেন। উদ্দেশে উদাসীন পতির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া একটু শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। যে ভয়ঙ্কর বাত্যা, তাঁহার জীবনজলধিকে চঞ্চল করিয়া বহিতেছিল, তাহা একটু শান্ত হইল।

দেবেশ বাবুর প্রেরিত প্রণিধি প্রস্থান করিলে কপালিনী ভাবিলেন,—"গণক ঠাকুর লিখিয়া দিলেন, প্রায়শ্চিত্ত!—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত কি?" তিনি এ চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। কোন কার্য্যে আস্থা নাই,—কোন দিকে মন নাই,—সারাদিন অবিশ্রান্ত এই চিন্তা,—"প্রায়শ্চিত্ত কি?" স্বপ্নের সহিত

জাগ্রতচিন্তার বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। তজ্জন্য কখন কখন এরূপ ঘটে,জাগ্রদবস্থায় যে বস্তুর অভাব অনুভব করা যায়,স্বপ্নে তাহার সমাবেশ হইয়া থাকে। কপালিনী সেই দিন সর্ব্বান্তঃকরণে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাহিতেছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিয়া গেল,—ভাবিতে ভাবিতে শয্যায় গমন করিলেন। মন, নিশ্চিন্ত না হইতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল। স্বপ্ন দেখিলেন;—আরাধ্যা নৃমুণ্ডমালিনী ভৈরবীবেশে শিরোভাগে উপস্থিত হইয়া কহিতেছেন,—"বৎসে, তুমি পতির নিকট অপরাধিনী হইয়াছ। প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে তাঁহার দর্শন পাইবে না। যদি সেই গৃহযোগী সতীপরায়ণ পতির চরণ ধ্যান করিতে করিতে আমার এই বেশে দেশে দেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতে পার এবং স্বামীর দর্শন পাইবামাত্র আমার ন্যায় যোগ-সিদ্ধির নিষ্ক্রয় দানের প্রতিজ্ঞা করিতে পার, নিশ্চয়ই স্বামীর দর্শন পাইবে। ইহাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত!" আরাধ্যা দেবী, স্বয়ং শিওরে দাঁড়াইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের ক্রোড়ে লালিতা হিন্দু যুবতীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আনন্দের আবেগে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভয়ভক্তিতে শরীর পুলকিত হইল। কপালিনী এই নিষ্ক্রয়ের অর্থ কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। পরিশেষে, পতির অবাধ্য হওয়া সতীর এতই উৎকট পাপ মনে করিয়াছিলেন যে, অভীষ্ট দেবীর মুখে এই উৎকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পাইয়াও কৃতার্থ হইলেন। স্বামীর দর্শন প্রত্যাশায় তৎক্ষণাৎ মনে মনে স্বপ্ন-প্রাপ্ত কঠিন ব্রত অবলম্বন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন,—

"দিদি,—

অজ্ঞান হইয়া তোমায় কতই কুবচন বলিয়াছি। তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা নাই। অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া এক দিন একটী কথা বলিয়াও তোমার কাছে ক্ষমা চাহি নাই। আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, পাপ স্বীকার করিবার,—ক্ষমা চাহিবার সময় উপস্থিত। আমার যাহা কিছু কাপড়, গহনা, টাকা কড়ি ও অন্য অন্য জিনিস পত্র আছে, সব তোমার। এ সকলে আমার আর দরকার নাই। আমায় ক্ষমা দানের চিহ্ন স্বরূপ আমার সাধের জিনিস গুলি তুমি ভোগ করিবে। পত্রের মধ্যে চাবির রিং থাকিল।

পাপিনী কপালিনী।"

পত্র খানির উপরিভাগে বাটীর কর্ম্মকর্ত্তার নাম লিখিয়া, যাহাতে সহজেই অপরে দেখিতে পায় এমন স্থানে রাখিলেন।

নিশার অবশেষ, তাঁহার উন্মীলিত লোচনের উপর দিয়াই চলিয়া গেল। প্রভাত হইল। কোকিলালাপের পরিবর্ত্তে দাঁড়কাকের অমঙ্গল বিরাব শ্রবণ করিলেন! দ্বার খুলিবামাত্র একটা কালো বিড়াল—'ম্যাও—ম্যাও" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ হঠাৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। কপালিনী এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শনেও, তখন একটু আনন্দজনক আশ্বাস পাইলেন। যেন বুঝিলেন, তাঁহার ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আসন্ন হইয়াছে। মলিনবেশে একগোছা উৎসৃষ্ট বাসন হস্তে বহির্গত হইলেন। দেবেশ বাবু এই ঘটনার পাঁচ দিন পরে কপালিনীর সন্ধানার্থ বাটীতে লোক পাঠান।

একত্রিংশ অধ্যায়।

হৃদয়—শূন্য—অপূর্ণ !

যশোহরের অন্তঃপাতী চাঁচড়ার দেবালয় দেশ বিখ্যাত। ঐ দেবালয় চাঁচড়ার রাজাদিগের বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে ; বাস্তবিক তাহা নহে। উহা কোন উদাসীনের স্থাপিত। দেব-সেবার সাহায্য জন্য রাজারা কিছু বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, এই মাত্র। ঐ দেবালয়ে দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য দেবতার দারুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তি সকল অপূর্ব্ব।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা,—"

এই দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি, একটী সুদীর্ঘ গৃহ মধ্যে পৃথক পৃথক কুঠরীতে অবস্থিত। প্রত্যেক দেবীর সম্মুখে একটী একটী পৃথক্ দ্বার আছে। ভক্তিমান্ শাক্তগণ, এই সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন। স্বস্বহৃদয়প্রোষিতা অভীষ্ট দেবীর প্রকৃত

মূর্ত্তি এই স্থলে প্রত্যক্ষ করেন। এই জন্য এই স্থানে সময়ে সময়ে দেশদেশান্তর হইতে অনেক শাক্ত সাধুর সমাগম হয়। প্রয়োজন হইলে ঐ সাধুগণ দেবালয়-সংস্পৃষ্ট অতিথিশালায় দুই এক দিন অবস্থিতি করেন। যে সকল উদাসীন, নাগা, সন্ন্যাসী নিয়ত পর্য্যটন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও কেহ কেহ ঐ স্থানে আতিথ্য গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে দেবসেবা ও অতিথি সেবার বিলক্ষণ পারিপাট্য ছিল। পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ দেবালয় দেখিয়া থাকিবেন।

আখ্যায়িকাবর্ণিত সময়ের একদা সায়ংকালীন আরতি শেষ হইলে, একজন সন্ন্যাসী আদ্যাশক্তি কালীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ জটায় শির বেষ্টিত,—তুষারধবল শ্মশ্রুরাজি আনাভি-প্রলম্বিত। কণ্ঠে কমলবীজের মালা,—পরিধান গৈরিক বাস। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, দুর্দ্দান্ত দস্যুর হৃদয়েও শান্ত রসের সঞ্চার হয়। ভূমিতে জানুপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত করিয়া অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। অনন্তর মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

"দেবি, আমি তোমার ভক্ত। তুমি যে শক্তির প্রভাবে মহাকালরূপী হৃদয়েশ্বরকে চরণ দলিত করিয়াছ, আমি তোমার সেই শক্তির মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের আশা করি। সেই মূর্ত্তির ধ্যানধারণায় সংসার-জয়ে উদ্যত হইয়াছি। সেই মূর্ত্তির কৃপাবলে,—

'স্বর্ণে লোষ্টে গৃহেহরণ্যে সুস্নিগ্ধে চন্দনে তথা,
সমতা ভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ।'

এই বচন সার্থক করিয়া নিরন্তর স্বর্গীয় সুরভি সম্ভোগের

আনন্দ অনুভব করিতেছি; তথাপি আমার হৃদয় শূন্য ও অপূর্ণ! হে জননি! কতদিনে ঐ শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিবে, তাহা তুমিই জান।" যোগিবর শ্যামাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া রাত্রি যাপনের জন্য অতিথিশালায় গেলেন। তথায় আরও কয়েকটী অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন ঘোরতর বৈষ্ণব। তিনি না জানিতে পারিয়াই এই শক্তি দেবালয় সংসৃষ্ট অতিথিশালায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতিথিশালার পরিচারকেরা পাছে তাঁহাকে কোন শক্তি নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিতে দেয়, তিনি এজন্য বড়ই উদ্বিগ্ন আছেন।

মলিন ও ছিন্ন কন্থায় বৈষ্ণব ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। মস্তকে একটী রাঙ্গাবনাতের বৃত্ত-সূচি টুপি,—তাহার উপর নামাবলী জড়ান। কক্ষস্থ ভিক্ষাভাজনে নামের মালা, ছাপা-তিলকের উপকরণ, হুঁকো, চকমকি, এক যোড়া খড়ম, চিরুণী, দর্পণ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী আছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে না,—তবু আপনিই কহিতেছেন,—

"আমরা পাঁচ পুরুষে বৈষ্ণব। তন্মধ্যে কেবল আমিই বিরক্ত বৈরাগী। যশোহরের জেলখানায় আমার একটি শিষ্য আছে। বিনা দোষে তাহার চৌদ্দবৎসর ফাটক হয়েছে। একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যই এ দেশে আসা। নচেৎ শ্রীপাঠ নবদ্বীপ ত্যাগ ক'রে প্রায় কোথাও যাইনে।"

আর একজন, তরুণবয়স্ক, পরম সুন্দর, শৈব যোগী। গৌরাঙ্গে শুক্লপাংশু লিপ্ত হওয়ায়, শুভ্র মেঘাবৃত শরৎ শশধরের ন্যায়, শরীর-শোভা প্রকাশ পাইতেছে। ললাটে রক্ত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। উভয় বাহুমূলে ত্রিবলী। পরিধান কাষায়বস্ত্র।

কাষায় উত্তরীয় যজ্ঞোপবীতবৎ বক্ষ বেষ্টন করিয়া আছে। মস্তকে জটা ভার,—কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ,—করস্থ ত্রিশূল দক্ষিণ ভাগে ভূমিতে প্রোথিত। তিনি বৈষ্ণবকে কহিলেন,—

"আপনাদের বিরক্ত হওয়ার ভাবনা কি? অনেক নব যুবতী বিধবা বৈষ্ণবী আপনাদের নিকট মাধুর্য্য রসের শিক্ষা লইতে আসেন। এমন সুবিধা থাক্‌তে চারি চালের মধ্যে স্ত্রী-পরিবার লয়ে বাস করবার হেঙ্গাম কেন সহ্য কর্‌বেন?"

বৈষ্ণব ঠাকুর কহিলেন,—

"তুমি পাষণ্ড! পাষণ্ড দলন পড়নি বুঝি?"

"আর তুমি সুধু ষণ্ড! যশোহর জেলখানার ন্যায় তোমার আর কয়টী শিষ্যা আছে? নচ্ছার।"

বৈষ্ণব ও তরুণ সন্ন্যাসীর মধ্যে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন প্রথমোক্ত শাক্ত যোগী অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতে ছিলেন। উভয়েরই বাক্য ও ভাব ভঙ্গীতে তিনি একটু বৈচিত্র অনুভব করিতে ছিলেন। বিশেষতঃ শৈব যোগীর বেশ ও বাক্যাদিতে সম্পূর্ণ অসঙ্গতি দর্শনে তাঁহাকে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া বোধ হইল। মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,—

"যোগিবর, যদি আমার প্রতি রুষ্ট না হন, তবে কিয়ৎ-কালের জন্য আমার সহিত স্থানান্তরে গমন করিলে, বাধিত হই। আপনার দ্বারা একটি মহৎ কার্য্য সিদ্ধির আশা করি।"

শৈব যোগী, শাক্তের শান্ত, গম্ভীর ও তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তির প্রভাবে তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন। উভয়ে অতিথিশালা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শৈব,—মহাত্মা!

পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত দেবালয়ের সন্নিকটে একটী নিবিড় বন ছিল। শাক্ত ও শৈব যোগী অতিথিশালা ত্যাগ করিয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বনান্ধকারে আত্ম-গোপন পূর্ব্বক সাবধানে ও মৃদুস্বরে নিম্নলিখিত রূপ কথোপ-কথন আরম্ভ করিলেন। শাক্ত জিজ্ঞাসিলেন,—

"যোগিন্, আপনি কোন্ কার্য্য সাধনোদ্দেশে এ ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন?" শৈব, একেবারে তাঁহার এইরূপ অসংশয়িত প্রশ্ন শ্রবণে এবং যে কারণে তাঁহার প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া এই নির্জ্জন বনে আসিয়াছেন, সেই কারণে অভীষ্টের সমস্ত অংশ গোপন রাখিতে পারিলেন না। উত্তর করিলেন,—

"মহাত্মন্, আমার অভীষ্ট যৎসামান্য। আপনার নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হই। অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন্।"

শাক্তের ধূমায়িত কৌতূহলানল প্রজ্বলিত হইল। কহিলেন,—'লজ্জার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমা হইতে আপনার কোন অনিষ্টের শঙ্কা নাই। আমি আততায়ীরও কুশল কামনা করি। আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আমাকে নিতান্ত আপনার জ্ঞান করিতে পারেন।''

শৈব, শাক্তের বাগ্‌জালে জড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—কিন্তু কিছু কিছু হাতে রাখিয়া কহিতে লাগিলেন,—

''আমার নিবাস এই গ্রামে। লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছি, প্রতিদিন নিশীথ সময়ে একটী আশ্চর্য্যরূপা ভৈরবী, ভৈরবী-মন্দিরে আসিয়া থাকেন। তাঁহার রূপ নাকি অসামান্য। এক বার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে কোন কু-অভিসন্ধি নাই।" শাক্ত যোগী, ঐ ব্যক্তির ভৈরববেশ পরিগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—''যদি ভৈরবীর ধর্ম্ম থাকে, তবে আমি তাঁহার জন্য প্রাণ দিব!" প্রকাশ্যরূপে কহিলেন,—

''ভৈরবীকে আপনি কিরূপে দেখিবেন?''

''যোগী ও যোগিনীগণের কোন কালেই দেবালয় প্রবেশে নিষেধ নাই। এই জন্যই আমি যোগিবেশ ধারণ করিয়াছি। ভৈরবীর মন্দির প্রবেশের পর আমি তথায় গমন করিব। তাঁহাকে দেখিব এবং গুপ্ত ভাবে তাঁহার গুপ্ত প্রার্থনা শ্রবণ করিব।''

"তাঁহার আগমন বার্ত্তা কিরূপে অবগত হইবেন?"

''দেবালয় দ্বারে আমার নিয়োজিত লোক আছে।"

শাক্ত দেখিলেন, শৈবযোগীর আয়োজনের ত্রুটি নাই। পুনরপি কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি যশোহর জেল্খানার স্ত্রী কয়েদীর বিষয় কিরূপে জানিলেন?" শৈব, হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া কহিলেন,—

"কই না!—আমি ত কিছু জানি না।"

"বঞ্চনা করেন কেন? বৈষ্ণব ঠাকুরকে তাঁহার শিষ্য প্রসঙ্গে কি বলিয়াছেন,—স্মরণ করুন।"

"আজ্ঞে তা বটে! তবে কি তা জানেন,—যশোহর জেল-খানায় এ পর্য্যন্ত একটীও স্ত্রী কয়েদী ছিল না। সম্প্রতি জেল বদ্‌লীতে হুগলি হইতে একজন এয়েছে। সে ঘোর বদ্‌মায়েস্। অনেক শক্ত শক্ত অপরাধে তার সাজা হয়েছে। এখানে এসেই একজন মুসলমান কয়েদীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'য়ে ধরা পড়েছে। বোধ হয়, তিনিই এই বিরক্ত বৈরাগীর শিষ্যা হবেন।"

"স্ত্রী কয়েদীর নাম কি?"

"সুধাময়ী।"

"আপনি কিরূপে এত সন্ধান রাখেন?"

"জেল দারোগার সঙ্গে আমার প্রণয় আছে, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে থাকি, তাঁরই মুখে সব সন্ধান পাই।"

"জেল দারোগার নাম কি?"

"আপনি উদাসীন, আপনার এত সন্ধানের প্রয়োজন কি?" বলিয়া শৈব প্রস্থান করিলেন। একে অন্ধকার, তায় বনাভ্যন্তর, শৈব কোন্ পথ দিয়া কোন্ দিকে গেলেন, শাক্ত তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই তমসাচ্ছন্ন নিবিড় বনমধ্যে একাকী এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভৈরবী।

আরতি শেষ হইল। দেবদেবীগণের নৈশ ভোগ রাগ সম্পন্ন হইল। পূজক ও সাধকগণ ভক্তিভাবে প্রসাদ পাইলেন। দেবালয় ও অতিথিশালার গোল চুকিয়া গেল। নিশাদেবী ক্রমে নীরব হইতে লাগিলেন। লোকজনের গতাগতি এক কালে রহিত হইল। এমন সময়ে একটী ভৈরবী, ভৈরবীমন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাম করে ত্রিশূল,—দক্ষিণ করে অক্ষমালা,—কণ্ঠে কপালস্রক্ দোদুল্যমান,—রক্তবসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। যে সকল অঙ্গে বসন ছিল না, তাহাও রক্তাভ দ্রব্যবিশেষে অনুলিপ্ত। আনুলম্বিত দীর্ঘকেশ, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্কন্ধদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক বক্ষোদেশে বিলম্বিত। মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষবলয়। যমুনার শ্যাম সলিলে ভাসমান জবাকুসুমের ন্যায়, তাঁহার সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু ভাসিতেছিল।

"মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত।"

ভৈরবীর রূপের জ্যোতি, ভৈরবীবেশ ভেদ করিয়া ভাসিতে ছিল। করস্থ অক্ষমালা ত্রিশূলে জড়াইয়া ত্রিশূল একপার্শ্বে স্থাপন পূর্ব্বক যোগিনী জানু পাতিয়া বসিলেন। বিমুক্ত কেশ-রাশি ভূমিবিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—

"জননি, তোমারই আদেশে যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। যোগসিদ্ধির যেরূপ পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহাও অবিচলিত চিত্তে শিরোধার্য্য করিয়াছি। কত দিনে অভীষ্ট দানে কৃতার্থ করিবে, তাহা তুমিই জান।"

ভৈরবী, এইরূপ স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক পুনরপি প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অক্ষমালাবিজড়িত ত্রিশূল হস্তে ছিন্ন-মস্তার গৃহে গমন করিলেন। বিহিত বিধানে প্রণাম করিলেন। তখন গভীর রাত্রি, চারিদিক্ নিঃশব্দ। কেবল সেই গৃহ চূড়ায় অমঙ্গল-স্বরে একটা কালপেঁচা ডাকিতেছিল। এই সময়ে ভৈরবী, একাকিনী নির্নিমিষলোচনে ছিন্ন-মস্তা ও তৎসঙ্গিনীগণের—

"ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকং,
প্রসারিতমুখীং দেবীং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাং,
বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং,
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাম্।
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং,

সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়েচ্চ মন্ত্রিণঃ,
বিপরীতরতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতি মনোভবৌ।
ডাকিনীং বামপার্শ্বেতু কল্পসূর্য্যানলোপমাং,
দেবীং গলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানপ্রকুর্ব্বতীম্।
করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্।”

এই মূর্ত্তি দেখিলেন! বিপরীতরতাসক্ত রতিকামের উপরি-ভাগে দেবী দণ্ডায়মানা। দক্ষিণ হস্তে স্বমস্তক ছিন্ন করিয়া বাম হস্তে ধারণ করিয়াছেন! ছিন্ন কণ্ঠ হইতে ত্রিধারে বিনির্গত রুধিরের একধারা ছিন্নবদনে পান করিতেছেন! দুই পার্শ্বে দুই ডাকিনী অপর দুই ধারা পান করিতেছে! এই মূর্ত্তি দেখিলেন! “কাম, ত্যাগ, আসক্তি, নৃশংসতা, শোণিতস্পৃহা, নির্লজ্জতা, একত্র মিলিত হইয়া দেবীর যে বীভৎস মূর্ত্তি উৎপন্ন করিয়াছে,—” তাহা দেখিলেন! মনে কত কি ভাবের উদয় হইল। তন্ত্রশাস্ত্রে এই অদ্ভুত মূর্ত্তির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, ভৈরবী ভাবিতে লাগিলেন,—“ভগবতী কপালিনী পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে(১) ঐশ্বর্য্যাদি(২) মদে হতজ্ঞান হইয়া ভগবান্ ভুবনেশ্বরের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যোগসাধনার্থ ভৈরবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। অনন্তর যোগানন্দে উন্মত্ত হইয়া

(১) কালী ও তারা মূর্ত্তির পদতলে শিব শবাকারে শয়ান এবং ভুবনেশ্বরীর সিংহাসন তলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট।

(২) ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ,
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ।

যোগসিদ্ধির নিশ্চয় স্বরূপ আত্মমস্তক দান করিয়া ছিন্নমস্তা হইয়াছেন!” ভৈরবী ক্ষণকালের মধ্যে এইরূপ চিন্তা করিলেন। এই চিন্তার সহিত তাঁহার যেন কোনরূপ পূর্ব্বস্মৃতির সংযোগ হইল। মনের সানন্দ ভাব, মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। কহিলেন,—

“দেবি ছিন্নমস্তে, তুমিই ধন্য! আমি অবোধ যোগিনী,—উন্মাদিনী,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর।” ভৈরবী এইরূপে প্রার্থনা সারিয়া প্রাঙ্মুখী হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একজন যোগী দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। যে মন্দিরে কামবক্ষো-বিহারিণী কামোন্মাদিনী রতির পৃষ্ঠোপরি ছিন্নমস্তা নৃত্য করিতে ছিলেন, ভৈরবী কপট ভৈরব কর্ত্তৃক সেই মন্দিরে অবরুদ্ধ হইলেন!
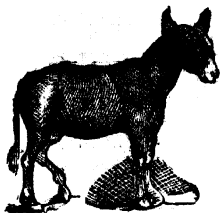
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সতীত্ব,—সতীর সহায়!

শাক্ত যোগী কিয়ৎক্ষণ পরে বিজন বনস্থ বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া চাঁচড়ার বাজারে গমন করিলেন। একজন দোকানদারকে একটী টাকা দিয়া একখানি পত্র লিখিবার উপযুক্ত যাবতীয় উপকরণ চাহিলেন। দোকানদার প্রথমে, কে একটা নাগাফকির জ্বালাতন করিতে আসিতেছে বলিয়া দোকানের দীপ নির্ব্বাণের উদ্‌যোগ করিতেছিল। কিন্তু যৎসামান্য বস্তুর বিনিময়ে একটি টাকা পাইয়া যোগিবরকে সাদরে বসিতে আসন দিল এবং পরম ভক্ত শিষ্যের ন্যায় ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কাগজাদি অর্পণ করিল। শাক্ত যোগী লিখিলেন,—

"মহিমার্ণব

শ্রীযুক্ত যশোহর জেলার মাজিষ্ট্রেট্

সাহেব সমীপেষু—

নিবেদন এই যে,রাম শঙ্কর ঘোষাল নামক যে দায়মালের আসামী, এক জন রক্ষীকে হত্যা করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুই মাস

তক ফেরার হইয়াছে এবং যাহাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করণার্থ সর্ব্বত্র হুলিয়া করা হইয়াছে, সে সম্প্রতি বৈষ্ণবের বেশে চাঁচড়ার অতিথিশালায় অবস্থিতি করিতেছে। কোন প্রয়োজনে স্বয়ংই কল্য যশোহরের জেলখানায় যাইবে। বিজ্ঞাপনমিতি।

শ্রীদেবেশ রায়

ঙঃ অঃ পুঃ হুগলী।"

যোগিবর ঐ পত্রে বৈষ্ণবের বেশ ও আকার প্রকারের সবিশেষ বর্ণন করিয়াছিলেন। উক্ত দোকানদারের পরিচিত কোন ব্যক্তিকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়া সেই রাত্রিতেই পত্র খানি যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার অতিথিশালায় গমন করিলেন। এই সময়ে ছিন্নমস্তার গৃহে অশরণা অবরুদ্ধা ভৈরবী কি করিতেছেন, পাঠক, একবার সন্ধান করিবেন কি? তিনি ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

'ঠাকুর, দ্বার পরিত্যাগ করুন আশ্রমে যাই।"

ভৈরব, জড়িত বচনে কহিলেন,—

"তোমার আশ্রম কৈলাস,—প্রেয়সি, আজ কৈলাস শূন্য প'ড়ে আছে। এই দেখ! তোমার প্রাণবল্লভ সম্মুখে উপস্থিত।"

ভৈরবী চমকিয়া উঠিলেন! ভৈরবের মুখ হইতে সুরাগন্ধ নির্গত হইতেছে। তাহার স্বর বিকৃত ও বাক্য জড়িত হইয়াছে। ভৈরবী আপনাকে কোন মদোন্মত্ত ছদ্মবেশী লম্পটের করকবলিত দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কহিলেন,—

"আপনি যেই হউন, যখন এই 'দেবেশ' মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তখন আমার ভক্তির পাত্র,—আপনাকে প্রণাম করি। দ্বার পরিত্যাগ করুন, -আশ্রমে যাই।"

ভৈরব একে সুরায় মত্ত, তাহাতে ভৈরবীর রূপে মোহিত। কহিলেন,—

"প্রিয়ে, কেবল ভক্তি ক'রে চল্‌বে না, একটু প্রেম কর,—প্রণামের বদলে একবার আলিঙ্গন কর।"

এই কটূক্তি শ্রবণে ভৈরবীর অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। কহিলেন,—

"আপনি এই গভীর রাত্রে দেববাসে অসহায়া অবলার সর্ব্বনাশে উদ্যত। আপনার অত্যাচার আমি সহিব, কিন্তু ধর্ম্ম সহিবেন না। এখনও বলিতেছি, আপনি দ্বার পরিত্যাগ করুন।"

"ভাই, তোর পায় পড়ি, আমার কথা রাখ্‌। আমি তোর জন্য প্রাণ দেবো।"

"রে ছদ্মবেশি লম্পট, এখনও তোর মাথায় বজ্রাঘাত হলো না?"

"কি বল্লি? আমি লম্পট? রোস্‌ তবে দেখাই।"

ভৈরব এই কথা বলিয়া যেমন সবলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। ভৈরব অস্ফুট অস্বাভাবিক স্বরে কহিলেন,—

"তুই আবার কে?"

পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল,—

"তোমার যম।"

"ছেড়ে দে বল্‌ছি, ভাল! তুই কে?"

"চেয়ে দেখ! আমি কে?"

"ওরে ঘাড় ফেরে না, একটু ঢল্‌ দে।"

"দিলাম।"

ভৈরব ফিরিয়া দেখিলেন,শাক্তযোগী। অধোমুখে কহিলেন,—

"ছি! বাবা! তোমার এই আক্কেল্?"

শাক্তযোগী অতিথিশালায় প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, সকলই নিদ্রিত। পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব ও শৈব কোথায় শয়ন করিয়াছে, সন্ধান করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবের সন্ধান পাইলেন,কিন্তু শৈবের সন্ধান পাইলেন না। মনে উদ্বেগ হইল। "মনের প্রতিজ্ঞা মনেই থাকিল" ভাবিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সত্বর ঠাকুর বাড়ী গমন করিলেন। ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে কয়েকটা বিল্ব ও বকুল বৃক্ষ ছিল। তাহার অন্যতরের অন্তরালে গুপ্তভাবে রহিয়া ভৈরব ও ভৈরবীর কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। দেবালয়ের অনুজ্জ্বল আলোকে এক একবার শৈবালজড়িত শতদলের ন্যায় ভৈরবীর দর্শন পাইতেছিলেন। ভৈরবীকে, ধ্যানমগ্ন ব্যোমকেশের শুশ্রূষা-নিরতা যোগিনী পার্ব্বতী বলিয়া, শাক্তের এক একবার ভ্রম হইতে লাগিল। এই যোগিনীকে দেখিয়া শাক্তের ভক্তি ও প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। যেন হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ হইতে ছিল! শাক্তের মনে কতই নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ভৈরবীর মনোভাব অবগত হইবার জন্য অতি গোপনে কথোপকথন শুনিতে ছিলেন। উপযুক্ত সময়ে নিঃশব্দে ভৈরবের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরেন। ভৈরবের তিরস্কার বাক্য শ্রবণে কহিলেন,—

"আমি,—কে দেখেছ? এখন আবার পূর্ব্ববৎ টিপে ধরি?" বলিয়া শাক্ত পুনরায় সবলে টিপিয়া ধরিলেন। ভৈরব, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ চাপাস্বরে কহিলেন,—

"আরে ছি! তুমি ত বড় অরসিক ভাই।"

"কেন! ভাল কোরে কি রস্ বেরুচ্চে না? তবে আর একটু জোরে টিপি।" বলিয়া শাক্ত টিপুনীর আর এক আঁচ বাড়াইয়া দিলেন। ভৈরব ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন,—

"ভাল চাস্ ত গলা ছাড়্।"

"ভালও চাহিব না,—গলাও ছাড়িব না।"

ভৈরব দেখিলেন! সম্মুখে পদাঘাত করায় সুবিধা নাই। সুতরাং যথাসাধ্য বলে শাক্তকে একটী চাইট্ মারিলেন। শাক্ত, তাঁহাকে সামান্য খর্পরখণ্ডবৎ অবলীলাক্রমে প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু শৈব ঠাকুরও দুর্ব্বল নহেন। তিনি পতিত হইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া এক লম্ফে দালানে উঠিলেন এবং শাক্তকে দৃঢ়রূপে বাহুবেষ্টনে ধরিলেন। উভয়ে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হইল। শৈবের শরীর শক্তিহীন ছিল না বটে, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র মল্ল-কৌশল অবগত ছিলেন না। শাক্ত, নিমিষ মধ্যে পুনরপি তাঁহাকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—

"তুমি যতবার আমায় আক্রমণ করিবে,—আমি ততবার তোমায় এইরূপে নিঃক্ষেপ করিব।" ভৈরব, যুদ্ধ ব্যাপারে সুবিধা না দেখিয়া পুনর্ব্বার মুখ ধরিলেন,—

"আমি বুঝ্লাম। তুই ঐ মাগীর উপপতি,—নইলে আমার উপর তোর এত রাগ কেন?"

"তুমি পুনরায় এরূপ কথা মুখে আনিলে এই ছুরিকা দ্বারা তোমার জিহ্বা ছিন্ন করিব।" শাক্ত এই কথা বলিয়া স্বীয় কটি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কালান্তক-যমজিহ্বাবৎ একখানি ছুরিকা বাহির করিলেন। ভৈরব তদ্দর্শনে কহিলেন,—

"তুই অস্ত্রধারী ডাকাত্,—তোরে এখনি গ্রেপ্তার কর্‌বো,—

জানিস্‌নে আমি কে? আমি যশোহরের জেল্ দারোগা,—ছদ্মবেশে ঠাকুর বাড়ীর বদ্‌মায়েসী সন্ধান কোত্তে এইছি।"

"বটে? তবে গ্রেপ্তার কর।" শাক্ত কথা বলিয়া ছুরিকা হস্তে তৎপ্রতি ধাবমান হইবামাত্র,ভৈরব,—ওরফে জেল্ দারোগা মহাশয়, বেগতিক দেখিয়া বেগে পলায়ন করিলেন।

ভৈরবী এতক্ষণ অবাক্ হইয়া তাঁহাদের কাণ্ড দেখিতে ছিলেন। যিনি ভৈরববেশে তাঁহার সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি যশোহরের জেল দারোগা এবং শাক্ত সাধুর কটিবস্ত্রে তীক্ষ্ণছুরিকা লুকায়িত, তাঁর বাহ্য আকৃতি বর্ষীয়ানের ন্যায়, কিন্তু যেরূপ বলের পরিচয় দিলেন, তাহা তরুণ বয়স্ক বীর পুরুষবৎ। এই ঘটনা গুলিতে ভৈরবী বিস্মিতা হইলেন। গলবস্ত্রে ভক্তি-ভাবে শাক্তের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন,—

"মহাত্মন্ আমি সামান্য ভিখারিণী। আপনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমায় পাপিষ্ঠের গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন,—আমি কিরূপে এই উপকারের ঋণ শোধ করিব?" শাক্ত কহিলেন,—

"যোগিনি! আমায় লজ্জা দেন কেন? ধর্ম্মই, আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, আশ্রমে গমন করুন।"

"সেই দুরাত্মা হইতে পথিমধ্যে বিপদের শঙ্কা করি।"

"এই ধরাধামে আপনার বিপদ নাই।"

যোগিনী দৈববাণীবৎ শাক্তের কথায় বিশ্বাস করিয়া দেবালয় হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শবাসনা।

যশোহরের নিম্ন দিয়া যে নদ প্রবাহিত, তাহার নাম ভৈরব। ইহা কেবল নামে ভৈরব নহে,—ইহার বক্রতা ভৈরব,—ইহার তীরবর্ত্তী শ্মশান সকল অতি ভৈরব!

"একদিন কুহুনিশি ভয়ানক অতি
অন্ধকারে দিক্ দশ দেখা নাহি যায়;
নিবিড় নীরদ নভে অসিত বরণ,
খেলিছে চপলা তায় আঁধারি দ্বিগুণ
বিশ্ব,—বিদারিত কর্ণ শব্দ কড় কড়ে!
ধরাতলে ঘন বন, তমস বসন—
জোনাকির বুটি কাটা,—সাজিয়াছে পরি
ভয়ঙ্কর রূপে; তায় পড়ে ধারাসার—
টপ্-টপ্-টুপ্-টাপ্ ঝপ্-ঝপ্ রব,
ভয় হয় শুনি! যথা পিশাচ অঙ্গনা
বিঘোর শ্মশান ভূমে চিবায় কপাল!"

বাস্তবিকও একদা অমানিশির এতাদৃশ সময়ে ভৈরবতীরবর্ত্তী
কান শ্মশানে পিশাচীগণ নর-কপাল চর্ব্বণের বিকট শব্দে চতুর্দ্দিক
াসিত করিতেছিল। চিতা সকল বৃষ্টিপাতে বীতাগ্নিবৎ হইয়া
মায়িত হইতে লাগিল। শৃগাল কুক্কুরগণ শুষ্কাস্থি চর্ব্বণে বিরত
ইয়া অর্দ্ধদগ্ধ শব, চিতা হইতে টানিতে আরম্ভ করিল। শবসঙ্গী
্যক্তিগণ খরপবন-তাড়িত বৃষ্টি ও করকা ভয়ে চিতা সন্নিধানে
তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। কাহারা বা অতি কষ্টে অল্পাবশিষ্ট
াব চিতা হইতে তুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতেছে;—কুক্কুরেরা
তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়া পুনরপি তাহা স্থলে তুলি-
তেছে। কচ্ছপ কুম্ভীরাদি জলজন্তুগণও মাংসগন্ধে লোলুপ হইয়া
নীরবে তীরে উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই শ্মশানের অদূরে একখানি ভগ্নগৃহে জনৈক "মুর্দ্দাফরাস"
বাস করে। ভৈরবের এই "মড়িঘাটা" তাহার ইজারা ছিল
এবং নগরের যাবতীয় অস্বামিক শব স্থানান্তর করিবার ভার,
তাহারই উপর অর্পিত ছিল। ইহাতে সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন
করিত। কিন্তু এক দিনের জন্যও তাহার দুর্দ্দশা দূর হইত না।
সে সুরা সেবনের জন্য অনেক অপব্যয় করিত। অষ্টপ্রহর সুরা-
পানে উন্মত্তবৎ হইয়া যেখানে সেখানে পতিত থাকায় অনেকেই
তাহার কটিতটস্থ "তহবিল তছরূপ" করিবার সুযোগ পাইত।
আবার মদ খাইয়া প্রায়ই "কল্পতরু" হইত। পৃথিবীতে এমন
লোকও আছে, যাহারা এতাদৃশ "কল্পতরুর" নিকটও দান গ্রহণ
করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পরিজনের মধ্যে তাহার উপপত্নী ও
তদ্‌গর্ভজাত একটী মাত্র কন্যা। তাহাদের দুরবস্থার সীমা নাই।
মরার কাপড় পরিয়া,—মরার বিছানায় শয়ন করিয়া,—দিনান্তে

অর্দ্ধ ভোজন করিয়া কোন রূপে জীবন যাপন করে। চিতা-লোকে গৃহের অন্ধকার নষ্ট করে,—চিতাবশিষ্ট অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠে রন্ধন হয়। অদ্য তাহার ভগ্নগৃহে দুইটি স্ত্রীপুরুষের মৃতদেহ রহিয়াছে। শবদ্বয়ের মুখ বস্ত্রাবৃত। পুরুষটীর ফাঁস হইয়াছে,—স্ত্রীটি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মুর্দ্দাফরাস তাহাদিগকে ভৈরবে ভাসাইয়া দিবার জন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে আনিয়াছে,—কিন্তু আকাশের দুর্য্যোগ বশতঃ এ পর্য্যন্ত ঘরেই পড়িয়া আছে। শৃগালাদির অত্যাচার শঙ্কায় গৃহস্বামী গৃহদ্বারে একটা আগুন জ্বালিয়া তাহাতে অনবরত ঘরের চালের খড় নিঃক্ষেপ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে শবদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া—"এই মাগী তোর মা,—আর এই মিন্‌সে তোর বাপ।" এইরূপ কহিয়া গৃহিণীর সহিত আমোদ করিতেছিল।

ইতিমধ্যে পাঠকের পরিচিত শাক্তযোগী ও ভৈরবী মুর্দ্দাফরাসের গৃহদ্বারে দেখা দিলেন। যে রাত্রিতে চাঁচড়ার দেবালয়ে ইহাঁদিগের দর্শন পাওয়া যায়, তাহার পাঁচদিন পরে তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হন। যোগী কিয়ৎকালের জন্য আশ্রয়ার্থী হইয়া গৃহস্বামীর হস্তে কি দিলেন। গৃহস্বামী দেখিল, একটী মোহর! চমকিয়া উঠিল। শব দুইটী ভূমিপৃষ্ঠে হইয়া শয়নবৎ অবস্থিত ছিল। আগন্তুকগণের অজ্ঞাতে অতি সত্বরে একটী অপরটীর উপর স্থাপন করিল। কতকগুলা লেপ, কাঁথা, কাপড় দিয়া সে দুইটীকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিল। অনন্তর আগন্তুকদ্বয়কে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া সেই শবনির্ম্মিত উচ্চাসনে বসিতে অনুরোধ করিল! গৃহে সম্ভ্রান্ত অতিথি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একটু উচ্চাসনে বসাইতে না পারিলে মনের তৃপ্তি হয়

না। মুর্দ্দাফরাস সে তৃপ্তি লাভ করিল যোগী, যোগিনীকে তদুপরি বসাইয়া আপনি নিম্নে উপবেশন করিলেন। গৃহে প্রবেশ মাত্র সুরাগন্ধ তাঁহাদের নাসিকা স্পর্শ করিল। আগন্তুকদ্বয় বুঝিলেন, গৃহস্থ মগুপ। গৃহস্বামিনী কদাচিৎ দীপ প্রজ্বালনের জন্য একটা মৃদ্ভাণ্ডে কিছু মরার চর্ব্বি সঞ্চয় করিয়াছিল। অতিথি উপস্থিত হওয়ায় তদ্দ্বারা একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। সেটি, দুর্গন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক কুটীরের এক কোণে মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। গৃহস্বামী, গৃহিণী ও কন্যাসহ বাহিরে আসিয়া বসিল এবং দীপ নির্ব্বাণের শঙ্কায় বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।
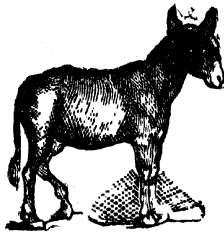
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ছিন্নমস্তা।

শাক্তযোগী, চাঁচড়ার দেবালয়ে ভৈরবীকে ভণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা করিলে পর ভৈরবী তাঁহার নিকট অভয় পাইয়া আশ্রমে গমন করিলেন। শাক্তের নিকট পরাজিত হইয়া ভণ্ড, পলায়ন করে বটে, কিন্তু শাক্ত পথিমধ্যে ভণ্ড হইতে ভৈরবীর ভয়াশঙ্কা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভৈরবীর দেবালয় পরিত্যাগের অল্পক্ষণ পরেই, শাক্ত গুপ্তভাবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ভৈরবী গ্রামের প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই তাঁহার আশ্রম। শাক্ত দেখিলেন! ঐ আশ্রম নিরাপদ নহে। ভৈরবীর অজ্ঞাতসারে সে রাত্রি তাঁহাকে প্রহরা দিলেন। ভৈরবী পরদিন হইতে নষ্ট বস্তুর অন্বেষণার্থিনী উদ্ভ্রান্তার ন্যায় নানা স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শাক্তও অতর্কিত ভাবে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। এইরূপে যোগিনীর নৈরাপদ কামনায় পাঁচ রাত্রি অজ্ঞাতে তাঁহার সঙ্গে ফিরিলেন।

ষষ্ঠ দিন অমাবস্যা। ঐ দিন ভৈরবী ভৈরবতীরে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভৈরবীর পূর্ব্ব পরিচিত একটী সন্ন্যাসী বিশেষ কোন সিদ্ধিলাভের বাসনায় ভৈরবের শ্মশান-বাসী হইয়াছিলেন। ইনি ভৈরবীর দীক্ষাগুরু। চতুর্থ ও ত্রিংশাধ্যায়ে ইহার উল্লেখ আছে। দৈবযোগে উপযুক্ত সময়ে ভৈরবী তাঁহার দর্শন পাইল। আজ ভৈরবী তাঁহার আশ্রমে শ্মশান-কালীর অমাবস্যা পূজা দর্শনার্থ গেলেন। পূজা দেখিয়া প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার ইত্যাদি কারণে অত্যন্ত বিপন্ন হইলেন। কোন উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। ঝটিকা-বৃষ্টি-মেঘ-গর্জ্জনের মধ্য হইতে ভৈরবী শুনিতে পাইলেন,—

"ভয় নাই!" স্বর, অল্প পরিচিত বোধ হইল। ক্ষণিক বিদ্যুৎ-স্ফুরণে ভৈরবী দেখিতে পাইলেন,—সেই শাক্তযোগী। ভৈরবীর হৃদয় শান্ত হইল। যেন ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকার সকলই দূর হইল। অন্তরের সহিত পথ ঘাট সকলই আলোকময় হইল। ভৈরবী কহিলেন,—

"মহাত্মন্, আবার বিপদে পড়িয়াছি।" উত্তর পাইলেন,—ভয় কি?"

শাক্ত এই কথা বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে লইয়া মুর্দ্দাফরাসের ঘরে আশ্রয় লইলেন। যেরূপ ভয়ানক সময় উপস্থিত, তাহাতে এরূপ জঘন্য আশ্রয়ও প্রার্থনীয় মনে করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক ঐ গৃহে শবাসনা ভৈরবী ও শাক্তযোগীর কিরূপ কথোপকথন হইতেছিল, পাঠক মহাশয়কে তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিতে হইবে। ভৈরবী কহিলেন,—

"মহাত্মন্, আপনি একদিন আমায় কপট শৈবের ঘৃণিত হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আবার আজ অতর্কিত রূপে দৈব বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। আমি কি জানিতে পারিব না যে, কোন্ মহাপুরুষ এত সদয় হইয়া আমার ধর্ম্মরক্ষা ও যোগসিদ্ধির অকারণ সহায় হইতেছেন? আমি সেই দেবালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অবধি পুনরায় আপনার চরণ দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়াছি। পরদিন চাঁচড়ায় যথাসাধ্য অন্বেষণ করিলাম, কোথাও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না। কোন প্রিয় বস্তু হারাইলে মন যেমন চঞ্চল হয়, আমার মন সেইরূপ হইল। কয়দিন ধরিয়া অন্বেষণ করিতেছি। আজ হঠাৎ দর্শন পাইলাম। আজ হইতে আমি আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিব না। আপনি কি আমায় সঙ্গে থাকিতে দিবেন না?" যোগী কহিলেন,—

"দেবি, আমি কিন্তু সেই দিন হইতেই আপনার সঙ্গী হইয়াছি। আপনার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে আসিয়াছি। দিবাভাগে যেখানেই থাকি, রাত্রিকালে আপনার আশ্রমের চতুর্দ্দিক রক্ষা করা ভিন্ন আমার অন্য কাজ নাই। ভৈরবী বিস্মিতা হইয়া আনন্দ গদগদ বচনে কহিলেন,—

"এরূপ কেন করেন? আমার জন্য এত ক্লেশ স্বী[illegible] কেন করেন? আমি কে?" যোগিবর কেবল শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

"দেবি, ভক্তগণ আপনাকে দেখিলে মনে করিতে পারেন, স্বয়ং ভক্তিদেবী, পৃথিবীকে যোগশিক্ষা দিবার জন্য যোগিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। আপনার নিবৃত্তিরূপিণী যোগিনীমূর্ত্তি দর্শনে, বিষয়ীর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। কিন্তু আমি আপনায়

প্রথম দর্শন হইতেই ভাবিতেছি, আপনি সামান্য তপস্বিনী নহেন, মহাবংশজাতা,—মহতের গৃহরমণী। কোন রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমার এ অনুমান সত্য কিনা বুঝিবার জন্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি।”

ভৈরবী দূরদেশে অপরিচিত উদাসীনের মুখে আপনার পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন! কিরূপে শাক্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন,—কি করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন,—ভৈরবী এই চিন্তা করিতেছিলেন। আবার এখন শুনিলেন, শাক্ত তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অতর্কিত রূপে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। হৃদয় গলিয়া গেল। আত্মপরিচয় দান শাক্তের কথঞ্চিৎ প্রীতিকর হইবে ভাবিয়া কহিলেন,—

“দেবাত্মন্, আমি অনেক দেবালয়,—অনেক অতিথিশালা ভ্রমণ করিয়াছি। অনেক যোগী, সন্ন্যাসী ও সাধু দর্শন করিয়াছি। কিন্তু সশস্ত্র উদাসীন কখন কোথাও দেখি নাই। আপনার এই শান্ত ও গম্ভীরাকৃতির সহিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা এবং বৃদ্ধ শরীরে অসাধারণ পরাক্রম দর্শনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি অগ্রেই আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রার্থনা করিয়াছি। আপনি সে কথার উত্তর দিলেন না। না দিলেন;—আপনি যেই হউন,—আপনার উদ্দেশ্য যাহাই হউক,—আপনাকে আত্মপরিচয়দানে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু ভগবতী ভৈরবী একটী কথা জীবনান্ত পর্য্যন্ত অপ্রকাশ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য ক্ষমা করিতে হইবে।” শাক্ত ভৈরবীর সারল্য ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় দর্শনে কহিলেন,—

"সাধ্বি, আমি যে শক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি,—যাঁহার প্রসাদে সাংসারিক দুঃখ বিপদ-প্রলোভনকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছি—আপনাকে যেন সেই শক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। এই জন্যই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আপনার সন্নিহিত হইয়া আছি,—আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি,—আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন দানের সংকল্প করিয়াছি। অতএব আপনার নিকট আত্মপরিচয় দানে আমারও কোন বাধা নাই।" ভৈরবী একথার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু অন্তঃকরণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল। কহিলেন,—

"আমি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে-জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার স্বামী ধন ও মানে অগ্রগণ্য। তাঁহার দেবোপম সৌম্য মূর্ত্তি, অন্তরের নির্ম্মলতা, বাক্যের মাধুর্য্য, অসামান্য বিনয় ও শিষ্টাচার অমানুষ সাধুভাব ইত্যাদি গুণ গ্রাম অনির্ব্বচনীয়। আমি এতাদৃশ স্বামীকে অবজ্ঞা করিতাম,—তাঁহার কথার অবাধ্য হইতাম,—তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য এক দিনও চেষ্টা করি নাই,—তাঁহাকে মনের সহিত এক দিনও ভক্তি করি নাই,—আমার মনোরঞ্জনার্থ তিনি কতই ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তথাপি 'আমি যে যারপর নাই অসুখিনী' সর্ব্বদাই এই ভাব প্রকাশ করিতাম। এই সকল কারণে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন। গৃহ ত্যাগ কালে বলিয়া গিয়াছেন, 'আমি পথের ফকির হইব, তায় আমার দুঃখ নাই, তুমি সুখে আছ শুনিলেই, সুখী হইব।" আমার ন্যায় শত নারীর পাণিগ্রহণ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও রাজার ভোগ্য অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার জন্যই গৃহত্যাগী হইয়া-

ছেন। ক্রমে আমার চৈতন্য হইল। হৃদয় শূন্য ও জীবন বিফল বোধ হইতে লাগিল। আপনাকে ঘোর পাপিনী বোধ করিতে লাগিলাম। পতিদেবের চরণে শরণ লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু তিনি কোথায়? ঠিক এই সময়ে জনৈক দৈবজ্ঞ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি আশ্চর্য্য গণনাবিদ্যার প্রভাবে কহিলেন, তোমার স্বামী জীবিত আছেন, —পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাঁহার দর্শন পাইবে। প্রায়শ্চিত্ত কি? ভাবিতে লাগিলাম। আরাধ্যা দেবী,—ভৈরবীবেশে স্বপ্নাদেশে প্রায়শ্চিত্ত শিখাইয়া দিলেন। ভৈরবীর আদেশে সেই দিন হইতেই শূন্যসংসার পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। প্রাণেশ্বর যে, কি বেশে কোথায় রহিয়াছেন, আজ এক বৎসরে তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। কত দিনে যে, প্রায়শ্চিত্তানলে হৃদয়ের পাপরাশি দগ্ধ হইবে, ভগবতী ভৈরবীই তা জানেন।'' এই সকল কথা বলিতে বলিতে ভৈরবীর বিশাল লোচন অশ্রুপ্লাবিত হইল। যোগী কহিলেন,—

''দেবি, তবে আমার আত্ম বিবরণ শ্রবণ কর। তুমি যাহার গৃহলক্ষ্মী,—যাহার হৃদয়ের পরমাশক্তি,—তোমার নিষ্ঠুরনীরস ও কঠোরাচারই, যাহাকে মুনিবৃত্তিরূপ পরম পদ (১) প্রদান করিয়াছে, আমিই তোমার সেই নির্দ্দয় স্বামী!! আমিই তোমাকে এত ক্লেশ দিতেছি! তুমি যে দিন আমার জন্য অশ্রুপাত করিবে, আমি সেই দিন আবার তোমার নিকটস্থ হইব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়া-

(১) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥

ছিলাম। তুমি গৃহে গমন করিয়া লৌহসিন্দুক মধ্যে এই প্রতিজ্ঞা পত্র দেখিতে পাইবে। আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। আজ আমি সেই প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রকাশ করিলাম। প্রতিকূলা প্রকৃতিই মানুষের শিক্ষয়িত্রী। তুমিই আমার সেই আরাধ্যাশক্তি! জীবনের মঙ্গলদায়িনী ইষ্টদেবী! তুমি ছায়াবৎ আমার অনুগামিনী হইয়া আমায় দাম্পত্য সুখে মোহিত করিলে, আমি চিরকালই মায়াকুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন থাকিতাম। তুমিই পদাঘাতে আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছ!"

"উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গৃহ ত্যাগ করিলাম। হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। চিন্তাবায়ু, সেই হৃদয়স্থ দহনের ভস্ত্রা হইল। নিয়ত এক বৎসর এই রূপে পুড়িলাম। কিন্তু হৃদয় ভস্মীভূত হইলনা। অগ্নি-পরিশোধিত কলধৌতবৎ উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হইয়া উঠিল। যাবৎ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিরূপে তোমার সহবাসবিরহে মনকে শান্ত রাখিব, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া সংসারিক সুখ-দুঃখাদি-বিষয়ক তত্ত্ব বুঝিলাম। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যই যাতনাজনক সংসার-বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমই পরমানন্দদায়িনী জীবন্মুক্তি, এই সত্যে বিশ্বাস হইল।(১) আত্ম জীবনে এই সত্যের পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। তোমারই প্রসাদে পরীক্ষার ফল পাইলাম। তোমার পবিত্র মূর্ত্তির ধ্যানে হৃদয় পবিত্র হইল। পাঁচবৎসরের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও মন সুখ ও শান্তি শূন্য হয় নাই; কিন্তু যাঁহার প্রসাদে আমার এত সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রিয়

(১) "বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপঃ।
মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ।"

কার্য্য সাধন করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল। গোপনে তোমার তত্ব লইতে আরম্ভ করিলাম; তুমি তাহার কিছুই জাননা। তোমারই গণক ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, তুমি আমার জন্য অশ্রুপাত করিতেছ। দেখিলাম, আমাদের পুনর্মিলনের সময় উপস্থিত। পুনরপি লোক পাঠাইলাম। লোক প্রত্যাগত হইয়া তোমার গৃহত্যাগের সংবাদ দিল। তদবধি একবৎসর, কেবল কপালিনী-ভক্ত শাক্ত যোগী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। আজ তোমারে পাইলাম। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। তোমারও, পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

শাক্তের শক্তি-ভক্তি, বৈষ্ণবের মাধুর্য্য, কিংবা অন্যবিধ উপাসকের আরাধ্যনিষ্ঠতা একই পদার্থ! প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর প্রেম এবং ভক্ত ও ভক্তিভাজনের প্রেম একই পদার্থ! ভৈরবী ও শাক্ত যোগী আজ তাহার প্রমাণ দিলেন। ভৈরবী, শাক্তের আত্মবিবরণ শ্রবণে আনন্দ ও উৎসাহে চঞ্চল হইলেন। লোচনদ্বয় আরক্ত ও বিস্ফারিত হইল। অপাঙ্গে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। নিমিষমধ্যে বদনমণ্ডলে ঈষৎ মলিনতা দেখা দিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"নাথ,—হৃদয়েশ্বর,—রায়হাটের রত্ন,—তুমিই আমার দেহ-দেবতা দেবেশ বাবু! আজ তোমার দর্শন পাইলাম! ক্ষণকালের জন্য একবার ছদ্মবেশ ত্যাগ কর। আমি ছয় বৎসর সে দেবমূর্ত্তি দেখি নাই। আজ নয়ন ভরিয়া দেখিব।"

শাক্ত শুক্লশ্মশ্রু, শুভ্র জটা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"দেবি, তবে তুমিও ক্ষণ কালের জন্য একবার ভৈরবী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি ধারণ কর।"

"প্রাণেশ্বর, আমি শীঘ্রই এ মূর্ত্তি ত্যাগ করিব। তোমাকে এ ভৈরবীমূর্ত্তি আর অধিক ক্ষণ দেখিতে হইবে না। আমাকে প্রাণ ভরিয়া তোমার চরণ দর্শন করিতে দেও।"

ভৈরবী, এই কথা বলিয়া এক দৃষ্টে দেবেশবাবুর চরণ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নয়ন অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। হঠাৎ যেন শরীরে দেবাবেশ হইল। সবলে অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিলেন। অঞ্চল দ্বারা দুই চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। একবার বাহিরে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে পাইলেন, শ্মশান-শরমার ভৈরব চীৎকার ভৈরব-সলিলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শ্মশানচারী শিবাগণের ঘোর রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। ভৈরবের বাতাহত তরঙ্গ সকল ভীষণ শব্দে কূলে আঘাত করিতেছে। ভৈরবী কহিলেন,—

"নাথ, আজ তোমার দর্শন পাইলাম। কৃতার্থ হইলাম—ব্রত সাঙ্গ হইল। তোমার চরণ দর্শনে সকল দুঃখ দূর হইল। আশীর্ব্বাদ কর,—যেন জন্মান্তরে তোমারই দাসী হইয়া মনের সাধে পতিসেবা করিতে পাই। এ জন্মে পতিসেবা সুখ পাই নাই। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিব। প্রাণাধিক, তোমাকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বলিয়া, তোমাকে দেখিতে পাইলাম। আর না,—সময় উপস্থিত; পাপিনীকে ক্ষমা করিও। এই, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত!!"

সত্বরে,—সতেজে,—স্পষ্টস্বরে—এই কথা কয়টী বলিয়া কপালিনী বাম হস্তে স্বমস্তক ধারণ করিলেন এবং কটিবস্ত্র হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ কণ্ঠে আঘাত করিলেন!!!

উপসংহার।

দেবেশবাবুর গৃহিণী রাজরাণী কপালিনী ঘোর শ্মশানে মুর্দ্দা-ফরাসের ঘরে অমাবস্যার রাত্রিতে স্বামিসমীপে পতিসেবাপরাধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিলেন্। এই ব্যাপার দর্শনে যোগীর যোগ ভঙ্গ হইল! হৃদয়, শক্তিশূন্য হইল! দেবেশ বাবু,—"হা! দেবি কপালিনি,—" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন!

মুর্দ্দাফরাস ও তাহার উপপত্নী বাহির হইতে আগন্তুক-দ্বয়ের প্রায় সকল কথাই শুনিতে পাইতেছিল। রায়হাট ও দেবেশ বাবুর নাম শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিল। দেবেশ বাবু সপরিবারে সন্ন্যাসীর বেশে ঘর ছাড়িয়া এমন সময়ে এমন স্থানে উপস্থিত, ইহা ভাবিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইল। প্রথমে উভয়েই পলাইবার পরামর্শ করিল। কিন্তু তাহাদিগকে যেন ভূতে টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহকৃত্য-দর্শনে উভয়েই এককালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

ক্ষণকাল পরে দেবেশ বাবু সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয়া কপালিনী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

ভিত্তিতে পশ্চাতে বাধা পাওয়ায় ভূপতিতা না হইয়া প্রায় পূর্ব্ববৎই বসিয়া আছেন। সর্ব্বশরীর শোণিতে ভাসিতেছে। কহিলেন,—

"কপালিনি, আজ বুঝিলাম, কেবল আমাকে যাবজ্জীবন দগ্ধাইবার জন্যই তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলে। জীবিতাবস্থায় চিরকাল জ্বালাইয়াছ,—আবার মরিয়াও জ্বালাইলে। এমন যাতনা দিয়া মরিলে যে, জীবনান্তেও তাহা ভুলিতে পারিবনা। দেবি, কেবল তোমারই জন্য এত তপস্যা করিলাম,—সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এমন কঠোর ব্রত আচরণ করিলাম, সকলই পণ্ড করিলে? আমার তপঃফলের আশা পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিলে? হা! উন্মত্তে, আমাকে যন্ত্রণা দিয়া পাপ করিয়াছিলে, আবার আমাকে যন্ত্রণা দিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলে? ধিক্ তোমার জীবনে! ধিক্ তোমার মরণে! ধিক্ তোমার প্রায়শ্চিত্তে! অথবা পতিসেবাপরাঙ্মুখী কামিনীগণের এইরূপ পরিণামই, হয়ত বিধিনির্ব্বন্ধ!" দেবেশ বাবু এই কথা বলিয়া বিমুখ হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মূর্চ্ছিত! সত্বর নিকটস্থ হইয়া অতি যত্নে তাহাদিগের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। মুর্দ্দাফরাস সংজ্ঞা লাভ করিয়াই একটু মধু পান করিল, এবং দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—

"হুজুর, আমি আপনার সাবেক চাকর গুরুচরণ। আমার এই দশা!—আজ আবার মাঠাকুরাণীকে মরার উপর বসায়েছি;—আমার কি হবে?"

দেবেশ বাবু কহিলেন,—

"তবেকি কপালিনী আমার জন্য শবসাধন করিলেন?"

গুরুচরণ কহিল,—

"না! মাঠাকুরাণী আপনার জন্য ছিন্নমস্তা হইয়াছেন। এই দেখুন।—" বলিয়া কপালিনীর আসনস্থ স্ত্রীপুরুষের শব দুইটী বাহির করিয়া দেখাইল। শব দ্বয়ের মুখাবরণ খুলিয়া দিলে দেবেশবাবু দেখিলেন, নায়ক রামশঙ্কর ঘোষাল ও নায়িকা সুধাময়ীর মিলিত শরীরোপরি ভৈরবী সত্যসত্যই ছিন্নমস্তা হইয়াছেন!! বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে ছিন্নমস্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। গুরুচরণের গৃহিণী, সুধাময়ীর মৃতদেহ দেখিয়া,—

"মা, তোমার এই দশা!" বলিয়া পুনরপি মূর্চ্ছিত হইল। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষায় সে সংজ্ঞা লাভ করিলে, দেবেশ বাবু অবগত হইলেন, স্বামিত্যাগিনী ঘোরপাপিনী হরিমতিই সেই ভীষণ নরকের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন!

গুরুচরণ পূর্ব্ব প্রণয়িনী হরিমতিকে আপনার নরক যাত্রায় সঙ্গিনী দেখিয়া কহিল,—"হরিমতি, এক সঙ্গে পাপ কোরেছি, আবার এক সঙ্গেই তার ফল পাচ্ছি।"

পাঠক দেখিতেছেন? যে নয় ব্যক্তিকে লইয়া এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইয়াছে, তাহার ছয় জন ঘটনাবশে ভৈরব-তীরবর্ত্তী ভীষণ শ্মশানে মুর্দ্দাফরাসের ঘরে অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে একত্র সমাগত। তন্মধ্যে দুই জন মৃত, তাঁহাদের ত কথাই নাই; অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যেও কেহ কাহাকে চিনিতেন না। দেবেশ বাবু ও কপালিনীর বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে; এখন গুরুচরণ, রামশঙ্কর, সুধাময়ী এবং হরিমতি এই চারি জন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া কপালিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে পারিলেই, আমরা নিমপাতা মুখে দিয়া গৃহে গমন করি।

গুরুচরণ রায়হাটের চিকিৎসালয়ে দীর্ঘকালে আরোগ্য লাভ

করে। উৎকট পীড়া বা উৎকট আঘাতের পর মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। বিশেষতঃ তাহার স্ত্রী ও দুইটী পুত্র ঐ কালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ভদ্রাসন নিষ্প্রদীপ করিয়াছিল। গৃহ, গৃহসামগ্রী, একটী ক্ষুদ্র ফলের বাগান প্রভৃতি গুরুচরণের যে সম্পত্তি ছিল, এই কালের মধ্যে প্রায় সে সমুদায়ই বিক্রীত হইয়া যায়। অধিকন্তু হরিমতির পীড়াকালে কিছু ঋণও দাঁড়াইয়াছিল। হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া একদিন চলে এমন সঙ্গতি ছিল না। এই সকল কারণে তাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল! বাড়ী ও রায়হাটে কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। উদর পোষণার্থ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে সে নেসার পাঠশালায় সিদ্ধি ফলা ধরিল। ক্রমে গাঁজা, গুলি, আফিং প্রভৃতির পাঠও অভ্যাস করিয়া ফেলিল। ঘুরিতে ঘুরিতে যশোহরে উপস্থিত হইল। প্রথমে চাঁচড়ার অতিথিশালায় আহার এবং ভিক্ষালব্ধ অন্নের বিনিময়ে নেসার খরচ চলিতে লাগিল। অতিথিশালায় আহার, মাদক সেবন এবং দেবালয়ে দেব দর্শন, এই তিনটী কার্য্য দ্বারাই কিয়ংকাল অতীত হইল। ক্রমে সকল দেবদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ছিন্নমস্তার দ্বারেই পড়িয়া থাকিত। এক দৃষ্টিতে দেবীর প্রতি চাহিয়া থাকিত এবং এক মনে কি ভাবিত। কোন সময়ে অতিথিশালাস্থ কোন বিদেশিনীর প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিয়া তথা হইতে তাড়িত হয়। ক্রমেই অধঃপাত! ভৈরবের মড়িঘাটার পূর্ব্বতন মুর্দ্দাফরাসের বাড়ী তাহার "আড্ডা" হইল। ঐ ব্যক্তি ঘোর মাতাল ছিল। গুরুচরণ রায়হাটে অবস্থিতিকালে অল্প পরিমাণে সুরার আস্বাদ পাইয়াছিল। সেই বীজ এতদিনে অঙ্কুরিত

হইল। গুরুচরণ মুর্দ্দাফরাসের সহবাসে মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। সুরাপানে ব্যয় অধিক, কেবল ভিক্ষায় চলে না। সে অন্নে অন্নে মুর্দ্দাফরাসের কাজ আরম্ভ করিল। কালক্রমে পূর্ব্ব ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় গুরুচরণই ঐ শ্মশানেশ্বর হইয়া উঠিল। গুরুচরণ যে কেবল তাহার "সম্পত্তিরই" উত্তরাধিকার করিল তাহা নহে ; ক্রমশঃ তাহার স্ত্রী ও কন্যারও প্রভু হইয়াছিল।

হরিমতি বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রথমে রায়হাটেই অবস্থিতি করে। কিন্তু রাখালের মঙ্গলার্থ দেবেশ বাবু কোন কৌশলে তাহাকে রায়হাট ত্যাগ করান। হরিমতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যশোহরে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় কুৎসিত রোগজন্য ও উপযুক্ত খাদ্যাদির অভাবে বিরূপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া যার পর নাই দুরবস্থাপন্ন হইল। শেষে অদৃষ্টবশে ভৈরবের মড়িঘাটায় পূর্ব্বতন মুর্দ্দাফরাসের গৃহিনী হইয়াছিল। কালক্রমে মুর্দ্দাফরাসের ঔরসে গর্ভধারণ করিয়া একটী কন্যা প্রসব করে। গুরুচরণ আসিয়া মুর্দ্দাফরাসের ঘরে আড্ডা লইবার কিছু পূর্ব্বেই, কোন অপরাধে শ্মশানবাস হইতে তাড়িত হয় এবং কিছুকাল পরে কন্যা সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার দুই এক দিন পূর্ব্বে আসিয়া পুনর্ব্বার প্রিয়তম গুরুচরণেরই প্রেয়সী হয়। কিন্তু নানা কারণে দীর্ঘকালে উভয়েরই আকৃতি প্রকৃতির এত পরিবর্ত্তন হইয়া ছিল যে, কেহই কাহাকে চিনিতে পারে নাই। উভয়েই উভয়ের নিকট নূতন! আজি ঘটনাবশে পরস্পর পরিচয় হইল।

রামশঙ্কর ঘোষাল নির্ব্বাসিত হইয়াও সুযোগক্রমে একজন রক্ষী সৈনিকের প্রাণ বিনাশ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কেবল বেশে নহে,—নামেও

ছদ্মতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনিই, আত্ম গোপন বাসনায় চাঁচড়ার অতিথিশালায় বিরক্ত বৈষ্ণবের বেশে ভণ্ড যোগীর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। দেবেশ বাবু তাঁহার বেশ ও বাক্যে একটু বৈচিত্র দেখিয়া তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া সংশয় করেন। যখন বনমধ্যে নির্জ্জনে শৈব যোগীর মুখে শুনিলেন যে, বৈষ্ণব ঠাকুরের শিষ্যা যশোহর জেলের স্ত্রী কয়েদী,—যিনি জেল বদলীতে সম্প্রতি হুগলী হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নাম সুধাময়ী, তখন বৈষ্ণব ঠাকুরকে ছদ্মবেশী রামশঙ্কর ঘোষাল বলিয়া তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল। কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতেই সুধাময়ীকে, খুড়ার উপপত্নী বলিয়া জানিতেন। এই জন্যই যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লেখেন। সাহেব, পত্র পাইয়াই সতর্ক হন। বৈষ্ণব ঠাকুর শিষ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যশোহর জেলে যাইবামাত্র ধৃত হইলেন। তাঁহাকে ছদ্মবেশ ত্যাগ করাইয়া, চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত মিলান হইল। তিনিই কারা হইতে পলায়িত ও শ্রীহরি-হত্যাকারী রামশঙ্কর ঘোষাল ইহা স্থিরীকৃত হইল। পূর্ব্বকৃত পাপরাশির সহিত, পলায়ন ও হত্যাপরাধ সংযোজিত হওয়াতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

সুধাময়ী হুগ্‌লী হইতে আসিয়া কয়েক দিন পরেই যশোহর জেলের এক জন মুসলমান কয়েদীর সহিত ব্যভিচার করেন, এ কথা জেল দারগা স্বয়ং দেবেশ বাবুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে দিন খুড়ার ফাঁসি হয়, সেই দিন সুধাময়ীও, মুসলমানের সহিত ব্যভিচারনিবন্ধন ক্ষণিক অধিকতর ঘৃণা ও অপমানের উত্তেজনায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। তিনিই আজ

মুর্দ্দাফরাসের গৃহে ছিন্নমস্তার পদতলে প্রিয়তমের হৃদয়ে শয়ান রহিয়াছেন!!

দেবেশ বাবু মনে মনে এই সকল অদ্ভুত ঘটনার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কপালিনীর চরিত্র আগা গোড়া মনে পড়িল। মনে যুগপৎ বিবিধ রসের স্রোত বহিতে লাগিল! "যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম নারীহৃদয়েও এমন শক্তি দানে সমর্থ, এখন সে ধর্ম্ম কোথায়?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শূন্যনয়নে কপালিনীর শোণিতাভিষিক্ত শবোপরি চাহিয়া রহিলেন!

গুরুচরণ কহিল,—"ঠাকুর দেখ্‌চেন কি? মাঠাকরুণ মানুষ নয়,—সাক্ষাৎ ভগবতী। দক্ষযজ্ঞের সময় ভোলাকে ভয় দেখাবার জন্যে একবার এই রূপ ধরেন,—আজ আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই রূপ ধরেছেন। আপনি এঁরে বড় দুঃখ দিয়েচেন।"

দেবেশ বাবু কহিলেন,—"গুরুচরণ, তাইকি সত্য?"

"সত্য নয়ত কি? এই দেখুন!" বলিয়া গুরুচরণ কপালিনী-কণ্ঠ-বিনির্গত-শোণিত-সিক্ত বসন নিষ্পীড়ন করিয়া কপালিনীর মুখে এক ধারা এবং হরিমতি ও তাহার কন্যার মুখে দুই ধারা রুধির দান করিয়া নৃত্য সহকারে গান ধরিল,—

"মহারাজ এ নারী কে নারি চিনিতে
কার বনিতে;—
অসিধরা ভয়ঙ্করী—শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে।
ত্রিধারে রুধির ক্ষরে,—এক ধারা মুখোপরে
ধরেছে বামা,—
আর দ্বি ধারা করিছে পান দ্বি যোগিনীতে।—

গুরুচরণের এই গান—আর নৃত্য! আবার গান,—আবার নৃত্য! করযোড়ে ছিন্নমস্তার সম্মুখীন হইয়া নৃত্য! কি ভয়ঙ্কর সময়! কি ভয়ঙ্কর স্থান! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! কি ভয়ঙ্কর নৃত্য! গুরুচরণ রায়হাট, দেবেশ বাবু, কপালিনী প্রভৃতি ভুলিয়া সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। স্মৃতির প্রদীপ নির্ব্বাণ করিবার জন্য দেবেশ বাবুর, গুরুচরণের সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তনের ক্ষণিক ইচ্ছা হইল। গুরুচরণের নৃত্য শেষ হইলে দেবেশ বাবু কহিলেন,—

"গুরুচরণ, তুমিই এই অদ্ভূত প্রতিমার নির্ম্মাতা; অতএব তুমিই ইহাঁর পূজা কর।" গুরুচরণ আপন ইচ্ছানুসারে ছিন্নমস্তার পূজারম্ভ করিল। পূজা শেষ হইলে দেবেশ বাবু কহিলেন,—

"গুরুচরণ, পতি-ভক্তি-বিহীনা বঙ্গবালাগণের মঙ্গলার্থ বর প্রার্থনা কর।" গুরুচরণ বর প্রার্থনা করিল। দেবেশ বাবু পুনরপি কহিলেন,—

"গুরুচরণ, সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়াছে, চল এখন ভৈরব-সলিলে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসি।"